শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের নির্বাচিত

প্রেমের গল্প

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের নির্বাচিত প্রেমের গল্প

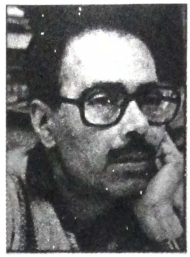

প্রেমের সঙ্গে জীবনের সম্পর্ক কী? জীবনের সঙ্গে প্রেমের? নাকি প্রেমই জীবন? অথবা জীবনই প্রেম?..... শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের প্রেমের গল্পগুলি আমাদের এই সব ভয়ঙ্কর প্রশ্নগুলির মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেয়, আমাদের দীর্ঘ-লালিত জীবন-প্রত্যয়কে বিপন্ন করে তোলে। জীবনের মর্মবাহিনী চেতনার যে অন্তর্প্রবাহ [Stream of Consciousness] আমাদের নিঃসঙ্গ অস্তিত্বকে প্রতি মুহূর্তে বিচলিত, আলোড়িত, বিস্মিত এবং প্রশ্নার্ত করে, সার্বভৌম প্রেম সর্বনিয়ন্তার মতো তাকে নিয়ন্ত্রণ করতে গিয়ে তার স্রোতে অসহায়ভাবে নিক্ষিপ্ত হয়ে কিভাবে পর্যুদস্ত হয়, ক্ষতবিক্ষত হয়, বাংলা সাহিত্যে শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের প্রেমের গল্পগুলি তারই অসৃষ্টপূর্ব রূপ-প্রতিমা। সেগুলি থেকে নির্বাচিত শ্রেষ্ঠ একগুচ্ছ প্রেমের গল্পের সংকলন শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের এই 'নির্বাচিত প্রেমের গল্প'। এর রূপ ভিন্ন, রং ভিন্ন, ভঙ্গি ভিন্ন, রসও ভিন্ন; এবং সেই কারণে স্বাদও ভিন্ন।.....

জন্ম ১২রা নভেম্বর, ১৯৩৫। দেশ— ঢাকা জেলার বিক্রমপুর। শৈশব কেটেছে নানা জায়গায়।পিতা-রেলের চাকুরে। সেই সূত্রে এক যাযাবর জীবন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় কলকাতায়। এরপর বিহার, উত্তরবাংলা, পূর্ববাংলা, আসাম। শৈশবের স্মৃতি ঘুরে ফিরে নানা রচনায় উঁকি মেরেছে। পঞ্চাশ দশকের গোড়ায় কুচবিহার, মিশনারী স্কুল ও বোর্ডিং— এর জীবন। ভিক্টোরিয়া কলেজ থেকে আই-এ। কলকাতার কলেজ থেকে বি এ। স্নাতকোত্তর পড়াশুনা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে। স্কুল-শিক্ষকতা দিয়ে কর্মজীবনের শুরু। এখন বৃত্তি— সাংবাদিকতা। আনন্দবাজার পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত। প্রথম গল্প— দেশ পত্রিকায়। প্রথম উপন্যাস— 'ঘুণপোকা'। প্রথম কিশোর উপন্যাস— 'মনোজদের অদ্ভুত বাড়ি'। কিশোর সাহিত্যে শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতিরূপে ১৯৮৫ সালে পেয়েছেন বিদ্যাসাগর পুরস্কার। এর আগে পেয়েছেন আনন্দ পুরস্কার।

প্রেমের □ নির্মলেন্দু মণ্ডল

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের

নির্বাচিত প্রেমের গল্প

বি কা শ

বিকাশ গ্রন্থ-ভবন
৩৭/৩, বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৯

Nirbachita Premer Galpa
by
Sirshendu Mukhopadhaya

প্রথম প্রকাশ ঃ বইমেলা— ১৯৯২
দ্বিতীয় প্রকাশ : নভেম্বর. ১৯৯২

প্রচ্ছদ ঃ শ্রী নির্মলেন্দু মণ্ডল

মূল্য ঃ তিরিশ টাকা মাত্র

প্রকাশ করেছেন ভারতী আচার্য ও ব্রতী আচার্য
৩৭/৩, বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ঃ ৭০০ ০০৯

ছেপেছেন স্বপন কুমার দে । দে'জ অফসেট,
১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলকাতা ঃ ৭০০ ০৭৩

সূচিপত্র

কথা
হাওয়া বন্দুক
আমি সুমন
উত্তরের ব্যালকনি
খগেনবাবু
দুরত্ব
আমরা
সম্পূর্ণতা
ভেলা

কথা

তোমাকে আমার অনেক কথা বলার আছে টুপু।

এ কথা প্রায়ই টুপুকে বলার জন্য যায় কুশল। বলা হয় না। কি করে হবে? টুপু যে বড্ড ব্যস্ত।

কুশল কলকাতায় এসেছে চার বছর। একটা বেসরকারী এঞ্জিনীয়ারিং শেখানোর স্কুল থেকে সে লেদ মেশিনের কাজ শিখেছিল। তার বেশী আর কি করার ছিল তার? গাঁয়ে তার বাবা মারা গেছে, কিন্তু চাষবাসের জমি আর অল্প-স্বল্প কিছু জীবনবীমার টাকা পেয়েছিল। তাও ভাগীদার অনেক। বিধবা মা আছে, এক দাদা আর এক ভাই আছে, ছোট একটা বোনও। দাদা চাষবাস দেখে, সেই থেকেই সংসার চলে। কুশল কলকাতায় এসেছিল ভাগ্যের অন্বেষণে। তেমন কিছু হয়নি তার। তবে মাথাটা পরিষ্কার বলে সে মেশিনের কাজ খুব তাড়াতাড়ি শিখে নেয়। কিন্তু কাজ পাবে কোথায়? মূলধনও নেই যে ব্যবসা করবে। সেই এঞ্জিনীয়ারিং স্কুলের মালিক সুধীর ভদ্র তখন তাকে ডেকে বলে—তোমার তো বেশ পাকা মাথা, কাজ না পেলে আমার এখানেই শেখাতে লেগে যাও বাপু, হাত-খরচ পাবে, থাকার জায়গাও দেব।

এক অনিচ্ছুক মামাবাড়িতে প্রায় জোর করে থাকত কুশল। তারা তাড়াতে পারলে বাঁচে। কিন্তু কুশল বড় মিষ্টভাষী আর সৎ চরিত্রের বলে একেবারে ঘাড়-ধাক্কা দিতে পারছিল না। কিন্তু কুশলের বড় লজ্জা করত। থাকার জায়গা পেয়ে সে এবার উঠে এল হ্যারিসন রোডের স্কুলের বাড়িতেই।

তো এই হচ্ছে কুশলের অবস্থা। একশো টাকার কাছাকাছি তার রোজগার। থাকার জায়গার ভাড়া লাগে না, নিজে রেঁধে খায়। কষ্টে তার চলে যায়। তবে কুশল সবসময়েই জীবনের আলোকিত দিকগুলোই দেখতে পায়। যেন জগৎ-সংসারকে দুভাগ করে একটা সৌভাগ্যের আলো আর দুর্ভাগ্যের অন্ধকার পাশাপাশি রয়েছে। অন্ধকারে যারা আছে তারা আলোর দিকে চলে যাওয়ার চেষ্টা করে, আবার আলো থেকে অন্ধকারেও কাউকে কাউকে

চলে আসতে হয়। কুশল তাই কখনো হাল ছাড়ে না। কিছু হবে, কিছু একটা হবে। হবেই।

তাই এই অন্ধকারের জীবনে ফুলগন্ধের মত, জ্যোৎস্নার মত একটাই আনন্দ আছে। সে হল টুপু।

তাদের গাঁয়ের পুরুতবাড়ির মেয়ে ছিল। বড় সুন্দর দেখতে। কত ছোট্ট ছিল। টুপু এখন কলকাতায় এসে খুব অন্যরকম হয়ে গেছে। খুব অল্প আয়াসেই টুপু তার দুর্ভাগ্য জয় করে আলোর দিকে চলে গেছে। সিনেমার অভিনেত্রী হিসেবে তার খুব নাম-ডাক। তার অনেক ভক্ত, অনেক চাহিদা।

কুশলের তাতে কিছু যায়-আসে না। সে মাঝে মাঝে টুপুদের হিন্দুস্থান রোডের বাড়িতে যায়। টুপুর মা আছে, বাবা আছে, একটা ভাইও আছে। তারা এখন সব বড়লোকের মত থাকে। ছোট্ট বাগান-ঘেরা তিনতলা বাড়ি, গেটে দারোয়ান, শিকলে বাঁধা কুকুর, হুট বলতে ঢোকা যায় না।

তবু কুশল ঠিকই ঢোকে। তার আটকায় না। ওরা যে তাকে অনাদর করে তা নয়, উপেক্ষাও করে না। আবার খুব একটা আদর-আপ্যায়নও নেই।

যেমন ওর বাবা বলে—ওঃ কুশল! কি খবর?

মা বলে—কি বাবা, কেমন! খবর সব ভাল?

তারপরই আর তেমন কথা-টথা হয় না।

কুশল দেখতে খুব সুন্দর নয়, আবার খারাপও নয়। সিনেমার নায়ক হিসেবে তাকে মানায় না ঠিকই, কিন্তু রাস্তায় ঘাটে দু'চারজন তার দিকে তাকিয়ে দেখে। মেশিন চালিয়ে তার চেহারা মেদহীন এবং পোক্ত। মুখশ্রীতে বুদ্ধি এবং অসম্ভব ভালমানুষীর ছাপ আছে। সুধীরবাবু টাকা-পয়সার বিষয়ে চোখ বুজে তাকে বিশ্বাস করেন।

টুপুর সঙ্গে খুব কমই দেখা হয়। বেশীরভাগ সময়েই তাকে বাইরে থাকতে হয়, নয়তো বন্ধুবান্ধব নিয়ে হৈ-চৈ করে। তবু দেখা হলে সে-ই সবচেয়ে আন্তরিক ব্যবহার করে। বলে—কুশলদা, আজ বাড়িতে খেয়ে যেও। তোমার দাদা কি করছে এখন? মা কেমন আছে? পুন্তিকে অনেককাল দেখি না। তার তো বিয়েব বয়স হল!

পুন্তি কুশলের ছোটবোনের নাম। এসব টুপুর মুখে শুনতে বড় ভাল লাগে।

কুশল বড় লাজুক। টুপুর সুন্দর মুখখানার দিকে ভাল করে চাইতে পারে

না। মাথা নত করে বলে—আমরা বড় গরীব হয়ে গেছি টুপু।

টুপু বলে—আহা, কি কথা। গরীব হওয়া কি অপরাধ নাকি! এই বলে সান্ত্বনা দেয় টুপু। কখনো বলে—তোমার যদি টাকার দরকার হয় তো নিও কুশলদা, লজ্জা কোরো না।

—না,না, টাকার দরকার নয় টুপু। এই মাঝে মাঝে এসে তোমাদের দেখে যাই শুধু। বেশ লাগে।

—দেখে যেও। আমাদেরও ভাল লাগে। তুমি যেন কি করো কুশলদা?

—একটা এঞ্জিনীয়ারিং কনসার্নে ইনস্ট্রাক্টর।

—ও বাবা, সে তো ভাল চাকরি! বলে টুপু ভ্রূ তোলে।

মিথ্যে কথা বা ফাঁপানো কথা কুশলের মুখে আসে না। তাই সে টুপুর ভুল ধারণা ভাঙার জন্য তাড়াতাড়ি বলে—না না, সে খুব ছোট্ট একটা কারিগরী স্কুল, আর ইনস্ট্রাক্টর বলতে—

কিন্তু অত কথা শোনার সময় টুপুর প্রায়ই হয় না। হয়তো চাকর এসে খবর দেয় যে গাড়ি তৈরি হয়ে অপেক্ষা করছে। কিংবা ছুকরী একটা সেক্রেটারী এসে কোন অ্যাপয়েন্টমেন্টের কথা মনে করিয়ে দেয়।

আসল কথাটাই বলা হয় না।

অবশ্য কথাটা যে কি তা আজও ভাল জানে না কুশল। কেবল তার মন বলে—তোমার সঙ্গে আমার যে অনেক কথা ছিল টুপু!

একবছর আর তেমন অবসর পেল না কুশল। সুধীরবাবুর স্কুল থেকে একটা পুরনো মেশিন কিস্তিবন্দীতে কিনে নিয়েছিল সে। হাওড়ায় একটা ছোট্ট ঘর ভাড়া করে ব্যবসা শুরু করেছিল। লাভালাভের দিকে তাকায় নি, ভূতের মত খেটে সে সুধীরবাবুর টাকা শোধ করে দিল সময়ের আগেই। আরো একটা মেশিন কিনল। আরো একটা।

ব্যবসা শুরু করলে বহু মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ হয়ে যায়। সেইরকম এক যোগাযোগে সে এক কালোয়ারের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে। কিছু টাকা লাগায় তার লোহার কারবারে, বেশ কিছু লাভ পেয়ে যায়। একবছরের মধ্যে তার গা থেকে হাঘরের ভাবটা ঝরে গেল।

টুপুর বাড়িতে একদিন মিষ্টি-টিষ্টি নিয়ে দেখা করতে গেল।

টুপুর বাবা ইতিমধ্যে মারা গেছেন। তার মা খুব বিষন্ন মুখে একটু খবরাখবর নিলেন।

বললেন—বাবা, আর তো দেখি খোঁজ নাও না!

—সময় পাই না পিসি। বড্ড কাজ। অভাব দূর করার চেষ্টা বড় মারাত্মক, হাড়-মজ্জা শুষে নেয়।

—সে তো জানি বাবা। তবু বলি, অভাবই ভাল। প্রাচুর্য মানুষকে বড় অমানুষ করে দেয়।

কথাটার মধ্যে একটা প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত ছিল। কিন্তু পরিষ্কার বুঝল না কুশল।

—সুখে থেকো, সৎ থেকো। এই বলেন টুপুর মা।

টুপুর সঙ্গে দেখা হল না। সে ঘুমোচ্ছে। ভীষণ ক্লান্ত।

সেই কথাটা আজও টুপুকে বলা হয় নি। কি কথা তা অবশ্য সে নিজে জানে না। হয়তো সে বলতে চায়—তুমি খুব সুন্দর টুপু। কিংবা—আমি তোমাকে ভালবাসি টুপু।

বলেই বা কি হবে? এসব তো কত লোকেই টুপুকে বলে। তবু বলতে ইচ্ছে করে কুশলের।

লোহার ব্যবসা খুব ভাল লাগছিল না তার। একেই অংশীদারি তার পছন্দ নয়, তার ওপর আয় এক জায়গায় উঠে আটকে যায়। তাই সে মূলধন তুলে নিয়ে লিলুয়ায় নিজের মত ছোট্ট ঢালাইয়ের কাজ শুরু করল। লোহার বড় টানাটানি বাজারে। মাল দিয়ে কুলিয়ে উঠতে পারে না। টাকাও আসে। তবু ঠিক খুশী হতে পারে না সে। একটা কাটিং মেশিন নীলামে কিনল। পাঁচ রকম ব্যবসার কাজে টাকা ঢালতে লাগল। বড় ভাই চাষবাস নিয়ে রইল বটে, কিন্তু ছোট ভাইটাকে আনিয়ে নেয় কুশল। দুই ভাই মিলে সাঙ্ঘাতিক খাটে।

টুপুর বাড়িতে যেতে সেদিন দেখা হয়ে গেল।

—আরে কুশলদা, কেমন আছ? তোমাকে খুব অন্যরকম দেখাচ্ছে।

—না না। দাড়ি কামিয়েছি তো, তাই।

—তার চেয়ে কিছু বেশী। বলে টুপু হাসে—তোমার উন্নতি হচ্ছে বোধহয়। চেহারায় ছাপ পড়েছে।

কুশল বলে—তোমার চেহারা একটু খারাপ দেখছি টুপু। কি হয়েছে?

—কি হবে? বড্ড ডায়েটিং করতে হয়! খাটুনিও তো খুব!

—আজকাল তোমার ছবি বড় একটা দেখি না তো।

—হচ্ছে। অনেক হচ্ছে। এই বলে টুপু খুব অস্থিরতা আর চঞ্চলতার সঙ্গে একটা সিগারেট ধরায়। ভীষণ অবাক হয় কুশল। চেয়ে থাকে।

—কিছু মনে কোরো না কুশলদা। নার্ভের জন্য খাই। আমার নার্ভ বড্ড সেনসিটিভ, ধোঁয়ায় একটু শান্ত থাকে।

—বেশী খেও না। দমের ক্ষতি হয়। খুব ভাল আর শান্ত গলায় কুশল বলে।

—বেশী না। মাঝে মাঝে খাই, নেশ-টেশা নেই।

আসলে নেশাই। কুশল সেটা টের পায়।

টুপুর মা দেখা হতে অনেকক্ষণ অন্য কথা বলে তারপর বলেন—বাবা, পেটের মেয়ে, পণ্ডিত বংশের সন্তান, বলতে নেই টুপু আজকাল মদও খায়। ভীষণ মাতলামি করে। কাউকে বোলো না।

অনেকক্ষণ ভেবেচিন্তে কুশল বলে—পিসি, খায় তো খাক। তুমি বেশী ঝগড়া-টগড়া কোরো না এ নিয়ে। ওর কাজের স্ট্রেন তো হয়, তাই খায়। ওকে রেস্টোরেটিভ বলে, মদ-খাওয়া নয়।

—তুমি বাবা, সব কিছুর ভাল দেখ। আমি দেখি না। ছেলেটাও সিনেমার লাইনে ঢুকবে-ঢুকবে করছে। বারণ করি, শোনে না।

কুশল আবার ভেবে বলে—টুপুর বুঝি আর তেমন চাহিদা হচ্ছে না পিসি? আজকাল ওকে নিয়ে ছবি হয় না তো।

—হয় না তো কি করবে! জীবনে ওঠা পড়া আছেই। আমি বলি, এবার ভাল আর সৎ দেখে পাত্র খুঁজে বিয়ে করে ফেলুক। সিনেমার নটী সাজা ঢের হল। ওদের বামুন-পণ্ডিতের বংশের রক্তে কি ওসব সয়!

ভাবতে ভাবতে কুশল চলে আসে।

স্কুলে থাকতে কবিতা পড়েছিল, সন্ন্যাসী উপগুপ্তর সঙ্গে বাসবদত্তার প্রেম হয়েছিল বুঝি! তো টুপুর সঙ্গে একদিন কি তার সেরকমই হবে?

হতেও পারে।

তিন বছরের মাথায় কুশল দেখল, তার অনেক টাকা। শুধু হয়েছে নয়, আসছেও।

ঢালাইয়ের কারখানার জায়গা বদল হয়েছে। ছোট্ট কিন্তু বেশ ভাল একটা ফাউন্ড্রি খুলে ফেলেছে দুই ভাই। দেশের বাড়ি মস্তবড় করে করেছে। পুকুর কাটা হয়েছে। চাষের জমিও কিনেছে অনেক। দাদা সে-সব দেখাশোনা করছে। কাজের সুবিধের জন্য একটা গাড়ি কিনে ফেলেছে কুশল।

সেই গাড়িতে একদিন গেল টুপুর বাড়ি।

টুপু সব দেখে বলল—কুশলদা, তুমি সত্যিই উন্নতি করেছ।

—আরে না, না। কোম্পানীর গাড়ি।

—ঐ হল। কোম্পানী তো তোমারই।

কুশল লজ্জা পায়। বড়লোকী দেখাতে সে তো আসে না। সে আসে টুপুকে একটা কথা বলবে বলে।

আজও বলা হয় নি।

টুপু একজন প্রডিউসারকে বিয়ে করল, কুশল খবর পায় এক পত্রিকায়।

গিয়ে দেখে টুপুর মা খুব খুশী নয়।

বললেন—দোজবরে বাবা, আগের বৌকে বিদেয় করেছে। তা টুপুকেই কি রাখবে। বড় ভয় করে। বড়লোকী বিয়ে আমার একদম পছন্দ নয়। বিয়ে ওরা করে না। আসল বিয়ে হয় মধ্যবিত্ত পরিবারে।

পিসি বলেছিল অদ্ভুত।

ওরা হানিমুন করতে জাপান না কোথায় গিয়েছিল। ঠিক তিন মাস বাদে ফিরে এসেই টুপু তার বরকে ডিভোর্স করে।

খবর পেয়ে ছুটে গেল কুশল।

—কি হল টুপু? বিয়ে ভেঙে দিলে?

—দিলাম। ওর হৃদয় নেই।

—আগে জানতে না?

—জানতাম। তবু ঢুকে দেখলাম আছে কিনা।

—ঢুকতে গেলে কেন টুপু? শরীরটা খামোখা এঁটো করলে।

মুখ-ফস্‌কা কথা। কুশল জিভ কাটল।

কিন্তু টুপু রাগ করল না। খুব অন্যমনস্ক হয়ে বলল—ঠিক বলেছ। এঁটো হয়ে এলাম। তবে অনেক টাকা পেয়েছি।

কুশল বলল—ভাল। টাকাগুলো রেখো। অসময়ে টাকা মানুষকে খুব দেখে।

টুপু এই প্রথম কাঁদল কুশলের সামনে।

বলল—টাকা আর নাম আমাকে ছেড়ে যাচ্ছে কুশলদা। তুমি তো উন্নতি করেছ, আমি যদি কখনো রাস্তার ভিখিরি হয়ে যাই তো কিছু ভিক্ষে দিও।

—ছিঃ টুপু, ওকথা বোলো না। টাকা রেখো। আর দরকার হলে নিও আমার কাছ থেকে। লজ্জা কোরো না।

—বড় লজ্জা কুশলদা। বড় লজ্জা।

আলোর পৃথিবী এগিয়ে আসছে।

কুশল বুঝতে পারে, সে নিজে সৌভাগ্যের আলোর চৌকাঠে পা রেখেছে, কিন্তু টুপুর সঙ্গে সেখানে দেখা হওয়ার নয়। কারণ টুপু আলোর জগৎ

থেকে নির্বাসিত হয়ে চলে আসছে দুর্ভাগ্যের অন্ধকার জগতে, সে-ও সেই যাত্রাপথে অন্ধকারের চৌকাঠে পা রেখেছে, ঠিক এই সীমানায় তাদের এখন পরস্পরের দিকে তাকিয়ে থাকা।

আজও বলতে পারল না কুশল। কিন্তু মন বলল—তোমার সঙ্গে আমার যে একটা খুব গোপন কথা আছে টুপু।

আজকাল কুশলের সময় বড় কম। কলকাতার ব্রাবোর্ন রোডে তার নতুন শো-রুম আর সেল্‌স অফিস চালু হল। তার ওপর আবার জাপানী একটা কোম্পানীর সঙ্গে কোলাবরেশনে চাষের যন্ত্র লাঙল তৈরী করবে বলে সে গেল জাপান। ঐ পথে দূর-প্রাচ্যের সব দেশ দেখে এল। কারখানা খোলার জায়গা পেল কলকাতার কাছেই। বড্ড পরিশ্রম গেল ক'দিন। বয়সও তো প্রায় সাঁইত্রিশ-আটত্রিশ হয়ে গেল। এখন শরীর না হোক মনটা বড় ক্লান্ত হয়ে পড়ে। মা বিয়ের তাগাদা দেয়। কুশল রাজী হয় না। ছোট বোনের বিয়ে দিল বড়লোকের বাড়িতে। সেই বিয়েটা আসলে একটা অলিখিত চুক্তি। আত্মীয়তার সূত্রে যাদের পেল তারা সমাজের ওপরতলার ভাল সব যোগাযোগের মধ্যমণি। এই সব বুদ্ধি এখন মাথায় খুব খেলে কুশলের।

কিন্তু তবু ক্লান্তি তো ছাড়ে না। যোধপুরের প্রকাণ্ড বাড়িতে ফিরে যখন কখনো অবসর কাটায় তখন বড় একা আর ক্লান্ত লাগে। মেয়েলী স্পর্শ জীবনে বড় দরকার। মেয়েরা হল পুরুষের বিশ্রাম, একটু সৌন্দর্য, আশ্রয়।

কিন্তু বিয়ে করবে কি করে কুশল? সেই কথাটা যে আজও টুপুকে বলা হয় নি। তাই সে ছোট ভাইয়ের বিয়ে দিয়ে দিল। অনেকদিন ধরেই এক সরকারী হর্তাকর্তা তাঁর মেয়েকে কুশলের ঘরে দেওয়ার জন্য অস্থির। কুশল তাঁকে তাই বিমুখ করল না। নিজে বিয়ে না করে ভাইয়ের সঙ্গে দিয়ে দিল।

আজও বড় লাজুক কুশল, এখনো যতদূর সম্ভব সৎ ও সচ্চরিত্র। এখনো তার চেহারায় তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও অসম্ভব ভালোমানুষীর ছাপ রয়ে গেছে।

খুব সকালবেলায় একদিন একটা পুরোনো গাড়িতে টুপু এসে তার বাড়ির সামনে নামল। খুবই কুণ্ঠিত আর লজ্জিত ভঙ্গীতে এল ভিতরে।

বলল—তুমি কি ভীষণ বড়লোক হয়ে গেছ! কি করে হলে?

লজ্জিত কুশল বলে—শোনো টুপু, ওসব কথা বোলো না। মেয়েরা টাকা-পয়সার কথা বললে আমার ভালো লাগে না!

টুপু শ্বাস ফেলে বলে—আমার খবর জানো?

—জানি টুপু, তুমি আজকাল একদম কন্ট্রাক্ট পাচ্ছ না। খবর নিয়ে জেনেছি, তুমি অনেক টাকা চাও বলে কেউ তোমাকে ছবিতে নেয় না! তার ওপর তুমি শুটিংয়েও যাও না ঠিকমত।

টুপু শ্বাস ফেলে বলে—আরো আছে। আমি নাকি নতুন নায়কদের মাথা চিবিয়ে খাচ্ছি। প্রায়ই নাকি ইউনিট থেকে তাদের কাউকে নিয়ে ইচ্ছেমত চলে যাই ফুর্তি করতে। এসব শোন নি?

—শুনেছি।

—বোগাস। এর কিছুই সত্যি নয় কুশলদা। এখন আমি ঘর থেকে মোটেই বেরোই না। অন্ধকারে বসে বসে কাঁদি।

—কেন কাঁদো টুপু? তোমার দুঃখ কি?

—বোঝ না? মানুষ যখন গুরুত্ব হারায়, যখন নিজের ধর্ম থেকে, ভিত থেকে নড়ে যায় তখন যে দুঃখ তার তুলনা নেই।

—বাজে কথা টুপু। তুমি গরীব বামুনের মেয়ে। তোমার ধর্ম বল, ভিত বল, গুরুত্ব বল, তার কিছুই তো তুমি পাও নি। যা পেয়েছিলে, যে অর্থ, যশ ও গুরুত্ব, তা তোমার পাওনা জিনিস ছিল না। একটু ভেবে দেখো।

—তবে কি আমার পাওনা ছিল?

কুশল ভেবে বলে—বোধহয় ভালবাসার মানুষের জন্য কষ্ট করার তৃপ্তিই মানুষের সবচেয়ে বড় পাওনা।

—ও বাবা, তুমি খুব কথা শিখেছ আজকাল। শিখবেই, বড়লোক হয়েছ তো। বড়লোকদের সব কথা বলবার অধিকার আছে।

কুশল যন্ত্রণায় কাতর স্বরে বলে—না টুপু। আমাকে বড়লোক বোলো না। আমি চেষ্টা করেছি মাত্র। চেষ্টাই মানুষের জীবন। বিষয়ের পরিবর্তনে মনের পরিবর্তন কি সবার হয়?

—আমি অত বুঝি না কুশলদা। আমি বলতে এসেছি আমি একটা ছবি প্রডিউস করব। টাকা দাও। শেষবার একটা চেষ্টা করে দেখি।

—দেব। কুশল বিনা দ্বিধায় বলে।

উপগুপ্ত আর বাসবদত্তার কবিতাটার শেষে যা ছিল, তা বুঝি ঘনিয়ে আসে। ছবিটা একদম চলল না। কুশল জানত, তাই টাকাটাকে খরচের খাতায় ধরে রেখেছিল।

প্রেস শো'তে তার পাশেই বসে ছিল টুপু। বলল—চলবে না, না গো কুশলদা?

কুশল খুব দুঃখিত মনে মৃদুস্বরে বলে—বোধহয় না।

—কেন কুশলদা? আমি তো আমার সর্বস্ব দিয়ে অভিনয় করেছি, গল্পটাও ভাল ছিল। সবই চেষ্টা করেছি।

কুশল তেমনি মৃদুস্বরে বলে—টুপু, কেন এত করলে? এর চেয়ে অনেক কম কষ্টে সুখী হওয়া যেত জীবনে।

বাড়ি বিক্রি করে দিয়ে টুপু একটা অ্যাপার্টমেন্টে থাকে এখন। একা একা। মা আর ভাই আলাদা থাকে। তাদের সঙ্গে বনিবনা হয় না টুপুর।

তার সেই অ্যাপার্টমেন্টে বিরাট পার্টি দিয়েছে টুপু তার জন্মদিনে। কুশলকেও নিমন্ত্রণ করেছে। কুশল সময় পায় না, তবু সময় করে গেল পার্টিতে।

গিয়ে দেখে, ফ্ল্যাটটা একদম ফাঁকা। রাশি রাশি খাবার সাজানো টেবিলে, ঘরদোরে প্রচুর আলো, সাজগোজ। তবু কেউ নেই। এমন কি একটা বুড়ি ঝি ছাড়া অন্য কাজের লোকও কেউ নেই। টুপু একটা সাদা খোলের তাঁতের শাড়ি পরে এলোচুলে জানলার ধারে বসে বই পড়ছে। মুখটা ম্লান, কিন্তু প্রসাধনহীন বলে তার সেই কৈশোরের কমনীয়তাটুকু ফুটে আছে।

কুশল অবাক হয়ে বলে—কি হল, লোকজন সব কৈ?

টুপু বই বন্ধ করে হেসে উঠে আসে, বলে—লোকজন! তারা আবার কারা? কাউকে বলি নি তো! শুধু তোমাকে।

—তাহলে এত আয়োজন দেখছি কেন?

টুপু অনেকক্ষণ চেয়ে থাকে কুশলের মুখের দিকে। তারপর খুব গভীর একটা শ্বাস ফেলে বলে—শোনো, আমি জীবনে দেদার পার্টি দিয়েছি। পার্টির শেষে যখন সবাই চলে যায়, তখন এঁটো বাসন, শূন্য মদের বোতল, ভাঙা কাচ, দলিত ফল সব পড়ে থাকে। ঘরটা বীভৎস লাগে। মনে হয় পরিত্যক্ত, ভুতুড়ে। তাই আজ কাউকে বলি নি।

—আমাকে যে বললে!

—তুমি! ওঃ, তোমার কথা আলাদা। আজ আমরা দুজনে পার্টি করব। আর আমাদের চারদিকে শূন্য চেয়ার, ফাঁকা ঘর, আর নির্জনতা থাকবে। কুশলদা, তোমার একার জন্য আজ পঞ্চাশজনের আয়োজন। তুমি সব এঁটো করে, নষ্ট করে যাও! আমি দেখি।

—পাগল! কুশল বলে।

—আমি পুরুষকে লজ্জা পেতে বহুকাল ভুলে গেছি। কিন্তু জান আবার

আমার খুব ইচ্ছে করে লজ্জা করতে। আমাকে একটু লজ্জা দাও কুশলদা।

—পাগল! কুশল স্নেহভরে বলে।

—শোন, তুমি ভাবছ আমি মদ খেয়েছি। না গো, এই দেখ, শুঁকে দেখ মুখ। বহুদিন হল ছেড়ে দিয়েছি। এই বলে ছোট্ট সুন্দর মুখখানা হাঁ করে কাছে এগিয়ে আনে টুপু।

কুশল ওর মুখের বাতাস শুঁকল। কি সুন্দর গন্ধ! ঐ ভাবেই দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ মোহাচ্ছন্ন হয়ে।

টুপু শ্বাস ফেলে মুখ সরিয়ে নিয়ে বলল—আজ আমার জন্মদিন কুশলদা। তুমি আমাকে কী দেবে?

সোনার একটা গয়না এনেছে কুশল। কিন্তু সেটা বের করল না। একটু ভাবল। তারপর বলল—টুপু, বহুকাল হল তোমাকে একটা কথা বলার চেষ্টা করছি। আজ তোমাকে সেই কথাটা বলি বরং। সেইটেই জন্মদিনের উপহার বলে নিও।

—কথা! বলে টুপু হাঁ করে চেয়ে থাকে কিছুক্ষণ। তারপর হঠাৎ বলে—এতদিন বল নি কেন?

—সময় হয় নি। কথারও সময় আছে টুপু।

টুপু হেসে মাথা নিচু করে লজ্জায়। তারপর অল্প একটু শ্বাসকষ্টের সঙ্গে বলে—আজ বুঝি সময় হয়েছে?

—হ্যাঁ। খুব দেরি হয়ে যাওয়ার আগেই এবার বলি। টুপু...

টুপু দুহাতে কান চেপে ধরে চেঁচিয়ে ওঠে—পায়ে পড়ি, বোলো না, বোলো না তো! বললেই ফুরিয়ে যাবে।

—বলব না? কুশল অবাক।

টুপু স্নিগ্ধ চোখে চেয়ে হাসল, বলল—সারা জীবন ধরে ঐ কথাটা একটু একটু করে বোলো। কথা দিয়ে নয়, অন্যরকম ভাবে।

হাওয়া-বন্দুক

দিন যায়। থাকে কথা।

মণিকার দিন যায়। কিন্তু কি ভাবে যায়, কেউ কি তা জানে? তার সুখের ধারণাও খুব বড় নয়, দুঃখের ধারণাও নয় বড়। ছোট সুখ, ছোট দুখে দিন তার কেটে যেত। বুকের মধ্যে প্রজাপতির মতো উড়ন্ত একটুখানি সুখ, বা ছোট্ট কাঁটার মতো একটু দুঃখ—এ তো থাকবেই। নইলে বেঁচে যে আছে তা বুঝবে কেমন করে মণিকা! কিন্তু সুখ দুঃখের সেই ছোট ধারণা ভেঙে, দুয়ার খুলে বিশাল পুরুষের মতো অচেনা দুঃখ যখন সামনে এসে দাঁড়ায়, যখন লুঠেরার মতো দাবি করে সর্বস্ব, তখন সেই দুঃখ আকাশ বা সমুদ্রের মতো ভুবন-ব্যাপ্ত বিশালতার ধারণা নিয়ে আসে। মণিকার দুর্বল মাথায় তা যেন ধরে না।

গড়ের মাঠে শীতের মেলায় তারা হেঁটেছিল দুজনে। তখন টুকুন ছিল না। সঞ্জয়ের সঙ্গে তখনো তার বিয়ে হয় নি। চুরি-করা দুর্লভ বিকেলে তারা ঐ রকম বেরোতে পারত। সঞ্জয় অফিস থেকে বেরিয়ে আসত, মণিকা পালাত কলেজ থেকে। একদিন তেমনি তারা গিয়েছিল শীতের মেলায়। মেলায় ছিল রঙীন আলো, সজ্জিত মানুষের ভিড়—নাগরদোলা, লক্ষ্যভেদের দোকান। ছিল ধুলো, শীতের বাতাস আর ছিল রোমহর্ষ। বিষণ্ণতা কোথাও ছিল না।

লক্ষ্যভেদের দোকানে চক্রাকারে সাজানো বেলুন, ঝুলন্ত খেলনা, বল, দোকানী ডাকছে—

—প্রতি শট্ পাঁচ পয়সা, আসুন, হাতের টিপ দেখে নিন।

সঞ্জয় দাঁড়ায়।

—মণিকা, হাতের টিপ দেখি?

—কী হবে ছাই! হাতের টিপ দেখে!

—দেখিই না, যদি অর্জুনের মতো লক্ষ্যভেদ করতে পারি।

—তাহলে কী হবে?

—অর্জুন লক্ষ্যভেদ করে কি যেন পেয়েছিল!

—দ্রৌপদী।

—আমিও পাবো মণিকাকে।

—পেয়ে তো গেছোই। সবাই জানে আমাদের বিয়ে হবে।

সঞ্জয় একটা শ্বাস ফেলে বলে, মণিকা তোমাকে বড় সহজে পেয়ে গেছি আমি। ঠিক। ডুয়েল লড়তে হয় নি, যুদ্ধ করতে হয় নি, মা-বাবা বাধা দেয় নি। কিন্তু এত সহজে কিছু পাওয়া ভাল?

মণিকা ভ্রূ কুঁচকে বলে, ভাল নয়, তবে তুমি কি চাও তোমার আমার মধ্যে বাধাবিঘ্ন আসুক?

—না না, তা নয়।

—তবে কি তুমি আমাকে মোটেই চাও না আমি সহজলভ্যা বলে?

—তাও নয়। তোমাকে চাই। কিছু এত সহজে নয়। সহজে কিছু পেলে মনে হয় পাওয়াটায় সম্পূর্ণ হচ্ছে না। জয়ের আনন্দই আলাদা।

মণিকা হাসল, বলল—তবে বরং আমি কিছুদিনের জন্য অন্য পুরুষের প্রেমে পড়ে যাই! কিংবা চলে যাই দু'বছরের জন্য দিল্লীর মাসীর বাড়িতে, বি.এ. পরীক্ষাটা না হয় ওখানেই দেব। নইলে চল, ঘুমের ওষুধ খেয়ে পড়ে থাকি। তুমি অনেক ঝামেলা-টামেলা করে আমাকে ফের বাঁচিয়ে তোল। তাতে বেশ দুর্লভ হয়ে উঠি আমি।

সঞ্জয় মৃদু হেসে বলে—না,না, অতটা করার কিছু নেই। বরং ঐ টারগেটের দোকানে চল। একটা বেলুন দেখিয়ে দাও। আমি ফাটাব।

—ফাটালে কি হবে?

—তোমাকে জয় করা হবে।

—না পারলে?

—জয় করা হবে না।

—তা হলে আমাদের বিয়েও হবে না?

সঞ্জয় মাথা নেড়ে বলল—না।

—বাবা, তাহলে আমি ওর মধ্যে নেই। আমি সব কিছু সহজে পেতে ভালবাসি।

সঞ্জয় তার হাতখানা ধরল। বলল—মণিকা।

—উঁ।

—ওই যে মাঝখানের হলুদ রঙের বেলুনটা, ওটাকে ফাটাব। তিন চান্সে।

—যদি না পার?

—না পারলে—

কথা শেষ করে না সঞ্জয়।

—না পারলে?

—বিয়ে হবে না।

মণিকা খুব গম্ভীর হয়ে বলল, শোন।

—কি?

—তুমি ইয়ার্কি করছ?

—না।

—সিরিয়াস?

—ভীষণ!

মণিকা শ্বাস ছেড়ে বলে,—তুমি ভীষণ জেদী। পুরুষমানুষের জেদ থাকা ভাল, কিন্তু যার উপর আমাদের মরণ-বাঁচন তা নিয়ে তোমার খেলা কেন?

সঞ্জয় কাতর স্বরে বলে,—মণিকা, আমরা যখন ছোট ছিলাম তখন থেকেই তোমার আমার ভাব। পাশাপাশি বাড়িতে বড় হয়েছি। বড় হতে হতেই জেনে গেছি তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে হবে। কত সহজ ব্যাপারটা বল তো!কোনো রহস্য নেই, রোমাঞ্চ নেই; প্রতিযোগিতা নেই। এ কেমন পাওয়া! আজকের দিনটাই একটু ক্ষণের জন্য এস একটু দুর্লভ হই। কিছুক্ষণ অনিশ্চয়তা খেলা করুক আমাদের মধ্যে।

মণিকার বড় অভিমান হয়েছিল মনে মনে। সে কি বাজীকরের দোকানের জিনিসের মতো হয়ে গেছে? সে কি লটারীর পুরস্কার? তাদের এতদিনকার সম্পর্ক একটা হলুদ বেলুনের আয়ুর উপর নির্ভর করবে অবশেষে? ছোট্ট একটু দুঃখ কাঁটার মতো ফুটল বুকে। ছোট্ট কাঁটা, কিন্তু তার মুখে বড় বিষ, বড় জ্বালা। মণিকার চোখভরে জলও কি আসে নি? এসেছিল। মুখ ফিরিয়ে সে সেই জলটুকু মুছে ছিল গোপনে। বলল—শোন, আমি লটারীর প্রাইজ নই। আমি তোমাকে পেতে চেয়েছি সমস্ত অন্তর দিয়ে। তোমাকে যে ভালবাসি সে আমার পুজো। আমি কেন নিজেকে অত হাল্‌কা হতে দেব? তুমি চল, ঐ দোকানে যেও না। ও খেলা ভাল নয়।

কিন্তু সঞ্জয় বড় জেদী, ঐ জেদই তাকে পুরুষ করেছে! ও জেদই মণিকাকে মুগ্ধ করেছে কত বার। সঞ্জয় মাথা নাড়ল। মুখে হাসি নিয়ে বলল—শোন মণিকা, বেলুনটা আমি ঠিক ফাটাব।

—এ সব নিয়ে খেলা কর না। চলে এস।

—না, প্লীজ, তিনটে চান্স দাও।

মণিকা একটা শ্বাস ফেলল। তারপর আস্তে আস্তে করে বলল, কিন্তু মনে রেখ, যদি না পার এ বিয়ে হবে না।

—আমিও তো তাই বলছি!

মণিকার ঠোঁট কেঁপে ওঠে। গলা ধরে যায় আবেগে। সঞ্জয়ের কাছে তার অস্তিত্ব কি এতই পল্‌কা! যদি ও না পারে তবে সে ওর কাছে মিথ্যে হয়ে যাবে! এই সামান্য খেলায় সারা জীবনের এত বড় একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে নেবে তারা? মণিকা ইচ্ছে করলে সঞ্জয়কে টেনে আনতে পারত জোর করে, কিংবা কেঁদে-কেটে বায়না করে নিবৃত্ত করতে পারত, যেমন সে অন্য সময় করে। কিন্তু ঐ সর্বনাশা মুহূর্তে হঠাৎ এক অহংকার-অভিমান-জেদ চেপে ধরল মণিকাকেও। তার জলভরা চোখ থেকে বিদ্যুৎ বর্ষিত হল। কান্নাটা চেপে রেখে সে বলল—বেশ।

দোকানী বন্দুক ভরে এগিয়ে দিল। সঞ্জয় বন্দুক তুলে একবার মণিকার দিকে তাকিয়ে একটু হাসল। বলল—মাঝখানের ঐ হলুদ বেলুনটা। বুঝলে লক্ষ্য কর।

—করছি। গম্ভীরভাবে বলে মণিকা।

সঞ্জয় কাঁধ পর্যন্ত বন্দুক তোলে। নিবিষ্ট মনে লক্ষ্য স্থির করতে থাকে। মণিকার একবার ইচ্ছে হয়, বন্দুকটা ওর হাত থেকে টেনে নিয়ে পালিয়ে যায়। সে তৃষিত চোখে চেয়ে দেখছিল, সঞ্জয়ের দীর্ঘকায়, সুন্দর দেহটি। ধারাল মুখ। অবিন্যস্ত চুল নেমে এসেছে কপালে। ঐ পুরুষ, আবাল্য পরিচিত মানুষটি একটু ভুলের জন্য চিরদিনের মতো হারিয়ে যাবে জীবন থেকে! এ কী ছেলেমানুষি!

ট্রিগার টিপল সঞ্জয়। শব্দটা ছড়াক করে মণিকার বুকে এসে ধাক্কা মারল। নড়িয়ে দিল তার দুর্বল হৃৎপিণ্ড। দেওয়াল ঘড়ির দোলকের মতো বুক দুলতে থাকে। সঞ্জয় পারে নি। হ্যাঁ এবং না—এর ভিতরে, আলো আর অন্ধকারের ভিতরে, সুখ ও দুঃখের ভিতরে টিক্-টিক্-টিক্-টিক্ করে যাওয়া-আসা করে তার বুকের দেওয়াল ঘড়ির পেন্ডুলাম। সে শুধু ফিসফিস করে বলে—আর মাত্র দু'টো চান্স। দেখ, সাবধান।

সঞ্জয়ের মুখের হাসি মুছে গেছে। ভ্রূ কোঁচকানো। সে আবার বন্দুক নেয় দোকানীর কাছ থেকে। তোলে। অনেকক্ষণ ধরে লক্ষ্য স্থির করে। কিন্তু মণিকা লক্ষ্য করে, ওর হাত কাঁপছে! বড় মায়া হয় মণিকার। সে বুঝল, এবারেও সঞ্জয় পারবে না, দু'চোখ ভরে আবার জল এল তার। ভাঙা কাচের ভিতর দিয়ে দেখলে যেমন অদ্ভুত দেখায় চারধারকে, তেমনি

চোখের জলের ভিতর দিয়ে সে দেখতে পেল, রঙীন আলোর সুন্দর মেলাটি যেন ভেঙেচুরে ধ্বংসস্তূপ হয়ে যাচ্ছে আস্তে আস্তে। প্রতিবিম্বই বলে দিচ্ছে, এ পৃথিবীর সুখ ভঙ্গুর, জীবন কত অনিশ্চিত।

সঞ্জয়ের হাওয়া-বন্দুকের শব্দ এবারও কাঁপিয়ে দিল মণিকাকে। সেই সঙ্গে যেন কেঁপে উঠল পৃথিবী, ভেঙে পড়ার আগে আর্তনাদ করে উঠল সমস্ত ভুবন। দ্রুত দোল খেতে লাগল বুকের দোলকটি, যেন বা খসে পড়ার আগে সে তার শেষ দোলায় দুলছে। এবারও লাগে নি।

সঞ্জয়ের মুখে রক্ত এসে জমা হয়েছে। ফেটে পড়ছে ভয়ঙ্কর মুখখানা। দুটো চোখ জল্ জল্ করে উত্তেজনায়! তার ঠোঁট সাদা। দোকানী আবার বন্দুক ভরে এগিয়ে দেয়। নির্লিপ্ত গলায় বলে—এবার মারুন। ঠিক লাগবে।

—লাগবে? সঞ্জয় প্রশ্ন করে।

দোকানদার তো ভেতরের কথা কিছু জানে না। সে তাই ভাল মানুষের মতো বলে—আসলে মনটা স্থির করাই হচ্ছে সত্যিকারের টিপ। চোখ আর হাত তো মনের গোলাম। মনটাকে স্থির করুন, ঠিক লাগবে।

সঞ্জয় বন্দুকটা শেষ বারের মতো হাতে নিল। তারপর মণিকার দিকে ফিরে চাপা গলায় ডাকল, মণিকা।

—উঁ!

—যদি না লাগে, তবে?

মণিকা শ্বাস ফেলে বলে, তুমি তো জানই।

সঞ্জয় মাথা নেড়ে বলে—জানি, ঠিক। তাই একটা কথা বলে নি যদি না লাগে তবে আমাদের সম্পর্ক কবে থেকে শেষ হবে।

মণিকা ধীর গলায় বলল, আজ। এখন থেকে।

—আমরা একসঙ্গে ফিরব না?

—না।

—তুমি একা ফিরবে?

—হুঁ।

—আজ থেকে অন্য মানুষ হয়ে যাবে? আমার মণিকা আর থাকবে না তুমি?

—তুমিই তো ঠিক করেছ সেটা।

সঞ্জয় ম্লান একটু হেসে বলল, হ্যাঁ। তারপর একটা শ্বাস ফেলে বলল—মণিকা, এবারও যদি না লাগে তবে আমাদের সম্পর্ক তো শেষ হয়ে যাবে। তবু তোমাকে বলি নি, আমি তোমাকে খুব, খুব, খুব

ভালবাসতাম। আর কখনো কাউকে এত ভালবাসতে পারব না।

মণিকা রুমাল তুলে দাঁতে কামড়ে ধরল, তবু কি পারে দমকা কান্নাটাকে আটকাতে! কোনক্রমে কেবল অসহায় একখানা হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলল, শোন।

—কী?

—শেষ চান্সটা থাক্। মের না।

—কেন?

—আমি তোমাকে ভালবাসি। ভীষণ।

—আমিও।

—তবে ওটা থাক। সারাজীবনের জন্য বাকী থাক।

—হেরে যাবো মণিকা? পালাবো?

—তাতে কি? কেউ তো জানবে না।

সঞ্জয় দ্বিধায় পড়ল কি? বন্দুকটা রাখল, একটা সিগারেট ধরাল। ভ্রূ কোঁচকালো, চোয়ালের পেশী দ্রুত ওঠানামা করল। সিগারেটটা গভীরভাবে টানল সে। ধোঁয়া ছেড়ে সেই ধোঁয়ার ভিতর দিয়ে মণিকার অস্পষ্ট মুখের দিকে চেয়ে রইল একটুক্ষণ। তারপর বলল, কেউ জানবে না? কিন্তু তুমি তো জানবে?

—কী জানবো?

—আমি যে পালালাম।

—আমি ভুলে যাবো।

সঞ্জয় মৃদু হাসে। মাথা নাড়ে।— তা হয় না। আমাকে বুকের মধ্যে নিয়েও তুমি মনে মনে ঠিকই জানবে যে, এ লোকটা কাপুরুষ। এ লোকটা শেষবার বন্দুক চালাতে ভয়ে পেয়েছিল। মণিকার চোখের জল গড়িয়ে নামল। দোকানদার অবাক হয়ে দেখছিল তাকে। সামান্য বেলুন-ফাটানো টারগেটের খেলায় কান্নাকাটির কী আছে, তা তো আর জানা ছিল না। রঙীন আলোর মেলায় আনন্দিত মানুষজন কেউই জানত না, মেলার মাঝখানে কী এক সর্বনাশা ঘটনা কত নিঃশব্দে ঘটে যাচ্ছে! সঞ্জয় ধীরে বন্দুকটা তুলে নেয়। মণিকা মুখ ফিরিয়ে নিল অন্যদিকে।

হাওয়া বন্দুকটা ধীরে ধীরে কাঁধের কাছে তুলে নিচ্ছিল সঞ্জয়। দিন যায়, কথা থাকে। দোকানদার বলছিল—হাত আর চোখ হচ্ছে মনের গোলাম। মন স্থির থাকলে লক্ষ্যভেদ হয়।

মণিকা ভাবে—তবে কি মনই স্থির ছিল না সঞ্জয়ের? মণিকার প্রতি

তবে কি স্থির ছিল না সঞ্জয়ের মন? তাহলে কেন বন্দুকের খেলার ঐ হেলাফেলা উদাসীনতা? মণিকা দাঁতে রুমাল ছিঁড়ে ফেলল টেনে। দু'হাত প্রাণপণে মুঠো করে তার চারধারে ভেঙে পড়ার আগের মুহূর্তের পৃথিবীকে দেখে নিল। নিষ্ঠুর, এবার চালাও ঐ খেলনা-বন্দুক। ভেঙে পড়ুক মণিকার জগৎ-সংসার! সেই ভগ্নস্তূপের ওপর দিয়ে হেঁটে আজ একা ঘরে ফিরে যাবে মণিকা।

চক্রাকারে সাজানো হরেক রঙের বেলুন। ঠিক মাঝখানে হলুদ বেলুনটা ফাটবে, না কি ফাটবে না? সঞ্জয় অনেকক্ষণ ধরে লক্ষ্য করে। নলের ওপর দিয়ে চেয়ে থাকে বেলুনটার দিকে। পৃথিবী সুতোয় দুলছে। এক্ষুনি ছিঁড়বে।

হাওয়া-বন্দুকের শব্দ শেষবারের মতো বেজে উঠল। সঞ্জয়ের স্খলিত হাত থেকে বন্দুকটা খসে যায়। মণিকা শিউরে ওঠে। ফিরে তাকায়।

চক্রের মাঝখানে হলুদ বেলুনটা নেই। ফেটে গেছে। নরম রবার ঝুলে আছে ন্যাকড়ার মতো। দোকানদার বলল, বাঃ, এই তো পেরেছেন!

তারা দু'জনে কেউই বিশ্বাস করে নি প্রথমে যে বেলুনটা সত্যিই ফেটেছে। বুঝতে সময় লাগে।

বিহ্বল গলায় সঞ্জয় ডাকে—মণিকা!

—উঁ।

—লেগেছে।

—যাঃ।

—সত্যিই। দ্যাখো।

মণিকা কাঁদে। তারপর চোখের জল মুছে হাসে। মেলাটাকেমন রঙীন আলোয় ভরা। সজ্জিত মানুষেরা কেমন হেঁটে যাচ্ছে চারদিকে। অবিরল ঘুরে যাচ্ছে নাগরদোলা। বেলুনটা ফেটেছে—সেই আনন্দ সংবাদ নিয়ে শীতের বাতাস চলে যায় দিগ্বিদিকে। চারধারকে ডেকে যেন সেই বাতাস বলতে থাকে—আনন্দিত হও, সুন্দর হও, সব ঠিক আছে।

তবু দিন যায়। কথা থাকে। বিয়ের পর চার বছর কেটে গেছে। তারা দু'জন এখন তিনজন হয়েছে। টুকুন তিন বছরে পা দিল। সেই মেলায় পা দিল। সেই মেলায় হাওয়া-বন্দুকের খেলা তাদের কি মনে পড়ে? পড়ে হয়তো, কিন্তু কেউ মুখে বলে না। সঞ্জয় সিগারেট খেত খুব। মণিকা কোনোদিন আটকাতে পারে নি। রাত বিরেতে উঠে কাশত। মণিকা ঘুম

ভেঙে উঠে উদ্বেগের গলায় বলত—ইস্। কী কাশি হয়েছে তোমার। মাগো!

সঞ্জয় কাশতে কাশতে বলে—স্মোকারস্ কাফ। ও কিছু নয়, বলেই আবার সিগারেট ধরাত।

—আবার সিগারেট ধরালে?

—সিগারেটের ধোঁয়া না লাগলে এ কাশি কমবে না। সিগারেট থেকেই এই কাশি হয়। সিগারেট খেলেই আবার কমে যায়।

—বিছানায় বসে খাচ্ছ, ঠিক একদিন মশারীতে আগুন লাগবে।

সঞ্জয় উদাস স্বরে বলে—লাগুক না।

—লাগুক না? দাঁড়াও দেখাচ্ছি। শীগগির সিগারেট নেভাও।

সঞ্জয় হাসতে থাকে, সিগারেট সরিয়ে নিয়ে বলে—আগুন লাগলে কী হবে মণিকা? সংসারটা পুড়ে যাবে। এই তো? পৃথিবীতে কিছুই তো চিরস্থায়ী নয়। যাক্ না পুড়ে।

মণিকা শ্বাস ফেলে বলে—তুমি বড় পাষাণ, বুঝলে! বড় পাষাণ!

সঞ্জয় উত্তর দেয়—তুমি তো জানই।

মুখে যাই বলুক মণিকা, মনে মনে জানে, একটুও নিষ্ঠুর নয় সঞ্জয়, একটুও পাষাণ নয়। বরং বেশী মায়ায় ভরা সঞ্জয়ের মন। তবু তারা সুখীই ছিল। সংসারে নানা সুখ-দুঃখ ছায়া ফেলে যায়। ছোট ছোট সুখ, ছোট ছোট দুঃখ। সে সুখ-দুঃখ কোন সংসারে নেই। সঞ্জয় মোটামুটি ভাল একটা চাকরি করে। তিন বছরের টুকুন সকাল আটটায় তার নার্সারি স্কুলে যায়। সারাদিন সংসারের গোছগাছ নিয়ে থাকে মণিকা। সে জানে, তার স্বামী সঞ্জয় একটু উদাসীন। তা হোক, তবু স্ত্রৈণ পুরুষের চেয়ে অনেক ভাল।

সংসারের হাজার কাজের মধ্যে যখন অবসর পায় মণিকা, তখন দক্ষিণের জানালার ধারে আলোয় এসে বসে। টুকুনের জামার ছেঁড়া বোতাম সেলাই করে। বাপের বাড়িতে চিঠি লিখে, রেডিও বাজিয়ে কখনো বা নিজেই গান গায় গুন গুন করে। সেই সব অন্যমনস্কতার সময়ে কখনো কখনো হঠাৎ মনে পড়ে দৃশ্যটা। চারধারে সেই রঙীন ভয়ঙ্কর খেলাটা বেশ জেগে ওঠে। দূরাগত চীৎকার শুনতে পায়, এক দোকানদার ডেকে বলছে প্রতি শট্ পাঁচ পয়সা, আসুন হাতের টিপ দেখেন।

আর তখন, মণিকা যেন সত্যিই দেখতে পায়, সামনে চক্রাকারে সাজানো হরেক রঙের বেলুনের ঠিক মাঝখানে হলুদ বেলুনটি। সঞ্জয় হাওয়া-বন্দুক

তুলে দাঁড়িয়ে আছে। চারধারে মুমূর্ষু পৃথিবী ভেঙে পড়ার আগে কেঁপে উঠছে, মণিকার বুকে দেওয়াল ঘড়ির দোলক ধাক্কা দেয়, পড়তে থাকে।

রাতে আজকাল সঞ্জয় বড় বেশী কাশে। কাশতে কাশতে দম আটকে আসে তার। মণিকা ওঠে। জলের গ্লাস এগিয়ে দিয়ে বলে—জল খাও তো!

—দাও।

—কাল তুমি ডাক্তারের কাছে যেও।

—দূর দূর! ডাক্তাররা একটা-না-একটা রোগ বের করেই, রোগ না থাকলেও। এ কাশি কিছু না। সিগারেটের প্যাকেটটা দাও তো টেবিল থেকে হাত বাড়িয়ে।

—খেও না, পায়ে পড়ি।

—আঃ, দাও না। সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়া কমবে না।

—রোজ তোমার এক কথা। তুমি আগে ডাক্তার দেখাও তো!

—ডাক্তাররা কিছু জানে না।

—তুমি খুব জানো।

—আমি ঠিক জানি। বরং একটা ওষুধ কিনে আনব।

মণিকা বিছানায় বসে সঞ্জয়ের চওড়া রোমশ বুকের ওপর হাত রাখে স্নেহে, এই পুরুষটিকে সে খুব চিনে গেছে। ভারী একগুঁয়ে, জেদী। তবু ভেতরে ভেতরে মেয়েদের মতোই নরম।

বুকে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে মণিকা বলে—নিজের ওপর তোমার একটুও নজর নেই। সারাদিন চা আর সিগারেটের ওপর আছো। এতো ভাল নয়, বুঝলে? কাল থেকে সকালে আর দু'কাপ চা দেবো না, দ্বিতীয় বারে, চায়ের বদলে দুধ দেবো।

—ধুস্।

—ওসব বললে চলবে না। খেতে হবে, আর অফিস থেকে তাড়াতাড়ি ফিরবে। সারাটা দিন তো বাসাতেই থাকো না। ঠিক যেন পেয়িং গেস্ট্।

—সারাক্ষণ ঘরে থাকা যায়?

—তাহলে আমি কী করে থাকি?

—মেয়েরা পারে, সংসারে তাদের জান্ পোঁতা হয়ে থাকে।

—তাই নাকি! আর, তোমার জান্ কোথায় পোঁতা আছে শুনি! নতুন করে কারো প্রেমে পড়ো নি তো?

সঞ্জয় হাসে, ইচ্ছে তো করে একটা হারেম বানিয়ে ফেলি, কিন্তু এ বয়সে কে আর ফিরে তাকাবে বল।

ফিরে তাকাবার লোকের অভাব নেই। সেদিন মনুর বিয়েতে ওর যে একদল কলেজের বন্ধু এসেছিল তাদের মধ্যে একজন শ্যামলা মতো মেয়ে হাঁ করে তোমাকে খুব দেখছিল।

—যাঃ! তোমার যতো বানানো কথা।

—সত্যি বলছি, মাইরি।

—আমার গা ছুঁয়ে বলছো তো।

—ও বাবা! বলে মণিকা হাত টেনে নেয়।

—কী হল! হাতটা সরিয়ে নিলে কেন?

—তোমাকে ছুঁয়ে দিলাম যে।

সঞ্জয় হাসে, গা ছুঁয়ে বলতে সাহস হচ্ছে না, তার মানে মিথ্যে কথা বলছো।

—না-গো, সত্যিই মেয়েটা দেখছিল।

—তবে গা ছুঁয়ে বলো।

—না না। তোমাকে ছুঁয়ে আমি কখনো দিব্যি গালি না।

সঞ্জয় বলল—তাহলে বলি, তুমি যে বড় দর্জির দোকানে ব্লাউজ বানাতে দাও, সেখানকার সুন্দর মতো সেল্‌সম্যানটি তোমার দিকে যেভাবে তাকিয়ে থাকে—

—যাঃ, বলবে না, নোংরা কথা। বলে মণিকা।

আর সেদিন পাড়ার ছেলেরা যে চাঁদা চাইতে এসেছিল তাদের মধ্যে একজন কেন তোমার কাছে জল চেয়ে খেয়ে গেল জানো?

—এই, এই, এমন মারবো না; কেবল বানাচ্ছে, চুপ করো। ওসব শুনলেও পাপ।

তারা দুজনেই খুব হাসতে থাকে। কারণ তারা জানে ওসব কথা সত্যি নয়, কিংবা হলেও তাদের কিছু যায় আসে না। তাদের ভালবাসা গভীর, গভীর।

সকালে টুকুন দুলে দুলে পড়ছে—ব্যা ব্যা ব্ল্যাক শীপ, হ্যাভ ইউ এনি উল? ইয়েস স্যার, ইয়েস স্যার, থ্রী ব্যাগ্‌স ফুল।

মণিকা রান্নাঘরে ঝিকে বকছে—রোজ তোমার আসতে বেলা হয়ে যায়। এঁটো বাসনপত্র পড়ে আছে ঝাঁটপাট হয় নি, সাতটা বেজে গেল, টুকুনের স্কুলের বাস আসবে এক্ষুনি, কখন কি হবে বল তো?

ঝি উত্তর দেয়, কি করবো বৌদি, বড় বাড়িতে বেশী মাইনে দেয়, তারা সহজে ছাড়তে চায় না। কেবল এটা করে যাও, ওটা করে যাও। তোমার বাড়ি সেরে আবার এক্ষুনি ও বাড়ি দৌড়োতে হবে।

—বেশী মাইনে যখন, তখন ও বাড়ির কাজই ধরে রাখো, আমারটা ছেড়ে দাও। আমি অন্য লোক দেখে নিই, পইপই করে বলি আমার ছেলের সকালে ইস্কুল, কর্তারও অফিস ন'টায়, একটু তাড়াতাড়ি এসো। তুমি কেবল বড়লোকের বাড়ির বেশী মাইনের কাজ দেখাও।

[বাথরুম থেকে ক্রমান্বয়ে কাশির শব্দ আসে]

টুকুন এক নাগাড়ে ব্যা ব্যা ব্ল্যাক শীপ পড়ে যাচ্ছে। মণিকা ডাক দিয়ে বলে, টুকুন কেবল ঐ কবিতাটা পড়লেই হবে? একটু অঙ্ক বইটা দেখে নাও। কাল অঙ্কে ব্যাড্ পেয়েছো।

মণিকা—বাথরুম থেকে ক্ষীণ গলায় সঞ্জয় ডাকে।

মণিকা উত্তর দেয়, কি বলছ?

—একটু শুনে যাও।

—দাঁড়াও, আমার হাত জোড়া, ডালে সম্বর দিচ্ছি।

—এসো না।

—উঃ, আমি যেতে পারব না। টুকুনের টিফিন বাক্স গোছানো হয় নি, জলের বোতলে জল ভরা হয় নি। এক্ষুনি বাস এসে পড়বে।

সঞ্জয় চুপ করে থাকে, তারপর আবার শোনা যায়, তার কাশির শব্দ। দম বন্ধকরা এই কাশি; তারপরই ওয়াক্ তুলে বমি করার শব্দ হয়।

—ওমা! কি হল! বলে মণিকা উঠে বাথরুমের বন্ধ দরজায় এসে ধাক্কা দেয়—এই কী হয়েছে? এই—ভিতর থেকে উত্তর আসে না, কোমল বেসিনে জল পড়ে যাওয়ার শব্দ হতে থাকে।

দরজায় ধাক্কা দেয় মণিকা। এই, দরজাটা খোলো না। কী হয়েছে তোমার? বমি করছো কেন?

সঞ্জয় উত্তর দেয় না।

মণিকা দরজায় ক্রমাগত ধাক্কা দেয়—এই, কী হয়েছে? ওগো, দরজাটা, খোলো না।

মণিকা চিৎকার করে ডাকে সুধা, এই সুধা—

সুধা দৌড়ে আসে—কী হল গো বৌদি?

—দ্যাখো, তোমার দাদাবাবু দরজা খুলছে না। কী জানি কী হল, অজ্ঞান-টজ্ঞান হয়ে গেল নাকি?

—শরীর খারাপ ছিল ?

—হ্যাঁ, তুমি শীগগির বাড়িওলাকে খবর দাও।

কিন্তু খবর দেওয়ার দরকার হয় না। ছিটকিনি খোলার শব্দ হয়, দরজা খুলে দেয় সঞ্জয়। তার দিকে তাকিয়ে মণিকা বিমূঢ় হয়ে যায়। অত বড় মানুষটাকে কেমন দুর্বল দেখাচ্ছে। ঠোঁট সাদা, মুখে রক্তাভা, চোখের দৃষ্টি খানিকটা ঘোলাটে। একটা হাত বাড়িয়ে সঞ্জয় বলে—ধরো আমাকে।

মণিকা দুহাতে জড়িয়ে ধরে মানুষটাকে। কী মস্ত শরীর, মাত্র বত্রিশ বৎসর বয়সের যুবক স্বামীটি; তার কী হল, কী হতে পারে মানুষটার ?

—কী হয়েছে তোমার ওগো ?

—কী জানি, কাশি এল খুব, কাশতে কাশতে বমি হয়ে গেল। আমাকে একটু শুইয়ে দাও।

....বাইরে বাসের হর্ন বাজে। টুকুন দৌড়ে আসে। মা, বাস এসে গেছে। টিফিন বাক্স আর জলের বোতল দাও।

—দিচ্ছি, দিচ্ছি বাবা।

টুকুন বাবাকে জিজ্ঞেস করে—কী হয়েছে বাবা ?

—কিছু না।

—শুয়ে আছো কেন ? আজ তোমার ছুটি ?

সঞ্জয় শ্বাস ফেলে বলে—ছুটি! না ছুটি নয়। তবে বোধ হয় এবার ছুটি হয়ে যাবে।

—কেন বাবা ?

—মাঝে মাঝে মানুষের ছুটি হয়ে যায় বিনা কারণে। বলে সঞ্জয় হাসে। বলে, তোমাকে খ্যাপালাম। কিছু হয় নি। তুমি ইস্কুলে যাও।

—যাই বাবা, টা টা।

—টা টা।

বাইরে বাসের শব্দ হয়।

মণিকা গম্ভীর ভাবে ঘরে আসে। হাতে দুধের কাপ। চামচে দিয়ে ভাসন্ত পিঁপড়ে তুলছে। কাপটা এগিয়ে দিয়ে বলে—দুধটা খেয়ে নাও।

—খেতে ইচ্ছে করছে না। এখনও বমির ভাবটা আছে। খেলে বমি হয়ে যাবে।

—আমি ডাক্তারকে খবর দিয়েছি।

সঞ্জয় একটা শ্বাস ফেলে বলে, সিগারেটের প্যাকেটটা দাও।

—না, আর সিগারেট নয়।

—দাও না, মুখটা টক-টক লাগছে। সিগারেট খেলে বমির ভাবটা কমবে। মণিকা বলল, না, এত বাড়াবাড়ি আমি করতে দেবো না।

ওঃ-বলে সঞ্জয় হতাশভাবে চেয়ে থাকে।

—শোনো, তুমি টুকুনকে কী বলছিলে?

—কী বলব?

—কিছু বলো নি? আমি পাশের ঘর থেকে সব শুনেছি।

সঞ্জয় একটু হাসে—কী শুনেছো?

—ঐটুকু ছেলেকে ঐ সব কথা বলতে তোমার মায়া হল না?

—ওকি বুঝেছে নকি?

—না-ই বা বুঝল! তুমি বললে কেন? ছুটি মানে কী, তা কি আমি বুঝি না?

—কী মানে বল তো?

—বলব না। তুমিও জানো, আমিও জানি।

—মণিকা সিগারেট দাও।

—না।

—তাহলে আবার কাশি শুরু হবে।

—হোক, সিগারেট কিছুতেই দেবো না। আগে বলো, কেন বলেছিলে ঐ কথা।

—এমনিই।

মণিকা কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে। বহুদিনের হারিয়ে যাওয়া একটা দৃশ্য মনে পড়ে। মেলার দোকানে মণিকাকে বাজি রেখে হাওয়া-বন্দুকে লক্ষ্যভেদের খেলা খেলছে সঞ্জয়। জীবনে মণিকা কেনোদিনই ঘটনাটা ভুলতে পারবে কি? পারবে না। মনে কেবলই সংশয় খোঁচা দেয়। যাকে ভালবাসে মানুষ তাকে কী করে এক মুহূর্তের খেয়াল-খুশীতে হারজিতের খেলায় নামিয়ে আনতে পারে? তবে কি সঞ্জয় কোনোদিনই তেমন করে ভালবাসে নি তাকে? সেই জন্য কি এই সাজানো সুন্দর সুখের সংসার ছেড়ে চলে যাওয়ার বড় সাধ হয়েছে তার? ও টুকুনকে কেন বলল মাঝে মাঝে মানুষের ছুটি হয় বিনা কারণে। ঐ ছুটির জন্য বড় সাধ সঞ্জয়ের?

মণিকা বিছানার একধারে বসল। স্বামীর মাথাটা টেনে নিল বুকের ধার ঘেঁসে। চুল এলোমেলো করে দিতে দিতে বলল, অমন কথা বলতে নেই, কখন স্বস্তির মুখে কথা পড়ে যায়। আর কখনো বলো না।

—আচ্ছা।

—আমাকে ছুঁয়ে বলো, বলবে না।

সঞ্জয় হাসল, বলল, সিগারেট দাও না মণিকা।

—না।

বাইরে বাড়িওয়ালার ছেলের ডাক শোনা যায়—বৌদি।

মণিকা বলে—বোধ হয় পল্টু ডাক্তারবাবুকে নিয়ে এল।

মণিকা বলল—আসছি পল্টু। মণিকা গিয়ে দরজা খোলে। ডাক্তারবাবু ঘরে আসেন।

—কী হয়েছে? ডাক্তারবাবু জিজ্ঞেস করেন।

সঞ্জয়ের কাশির দমকাটা আবার আসে। দাঁতে দাঁত চেপে বলে—কিছু না। স্মোকরস্ কাফ্।

—দেখি, আপনি ভাল করে শুন তো।

ডাক্তার সঞ্জয়কে মনোযোগ করে পরীক্ষা করতে থাকেন। মণিকাকে একটা টর্চ আনতে বলেন, টর্চ দিয়ে গলাটা দেখেন ভাল করে। গলার বাইরের দিকে কয়েকটা জায়গা একটু ফুলে আছে। সেগুলো হাত দিয়ে টিপে টিপে দেখে জিজ্ঞেস করেন—এগুলো কতদিন হলো হয়েছে?

—কী জানি! সঞ্জয় উত্তর দেয়।

ডাক্তারবাবুর মুখটা ক্রমে গম্ভীর হয়ে আসে। একটা প্রেসক্রিপশন লিখে দিয়ে ওঠেন। মণিকা তাঁর সঙ্গে সঙ্গে বাইরের ঘরে আসে।

—ডাক্তারবাবু!

—বলুন।

—কী রকম দেখলেন?

—তেমন কিছু বুঝতে পারছি না। ওষুধগুলো দিন। দেখা যাক।

হঠাৎ এক অনিশ্চয়তা, এক ভয় চেপে ধরে মণিকার বুক। ভগবান, ডাক্তার কেন বুঝতে পারছে না?

কয়েকদিন কেটে যায়। ওষুধে তেমন কোনো কাজ হয় না। কাশিটা যেমনকে তেমন থেকে যায় সঞ্জয়ের। কিছু খেতে পারে না, ওয়াক্ তুলে বমি করে ফেলে। শরীরটা জীর্ণ দেখায়। মস্ত চুল ভর্তি মাথাটা বালিশে ফেলে রেখে পায়ের দিকের জানালাটা দিয়ে উদাসভাবে বাইরের দিকে চেয়ে থাকে। কেবল চেয়ে থাকে।

মণিকা ডাকে—শুনছো?

—উ।

—একটু হাঁটাচলা করো। শুয়ে থাকো বলেই তোমার খিদে পায় না।

—একটা সিগারেট দেবে মণিকা?

—না।

—পাষাণ, তুমি পাষাণ!

মণিকার চোখে জল আসে, বলে—কোনোদিন তো বারণ করিনি জোর করে। অসুখ হল কেন বলো। ভাল হও, তারপর খেও।

—যদি ভাল না হই?

—ফের ঐ কথা? তুমি বলেছিলে না যে আর বলবে না।

সঞ্জয় শ্বাস ফেলে, চুপ করে থাকে। ডাক্তার মাঝে মাঝে এসে তাকে দেখে যায়। একদিন চিন্তিতমুখে ডাক্তার মণিকাকে আড়ালে ডেকে বলে—গলার ঘা-টা একটু অন্য রকম মনে হচ্ছে। বরং ডাক্তার বসুকে একবার দেখান।

—আপনার কি মনে হয়।

—কিছু বলা মুশকিল। দীর্ঘস্থায়ী কোন ঘা দেখলে অন্যরকম একটা সন্দেহ হওয়া অস্বাভাবিক নয়। হয়তো তেমন কিছুই নয়। তবু দেখালে নিশ্চিত হওয়া যায়।

ডাক্তারবাবু চলে গেলে মণিকা স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। ডাক্তারের কথার অন্তর্নিহিত অর্থ বুঝতে তার দেরি হয় না। ডাক্তাররা সহজে নিজের অক্ষমতা প্রকাশ করেন না, সুতরাং—

সুতরাং মণিকা বুঝতে পারে, এতকাল ছোট সুখ, ছোট দুঃখের সঙ্গেই ছিল তার ভাব-ভালবাসা। এখন হঠাৎ সদর দুয়ার গেছে যে খুলে, অচেনা, বিশাল পুরুষের মতো এক বড় দুঃখ এসে দাঁড়িয়েছে দরজায়। লুবিয়ার মতো, মণিকার ছোটো মাথা তা বইতে পারে না। এ যে আকাশ পর্যন্ত ব্যাপ্ত, এ যেন সমুদ্রের মতো সীমাহীন, এ দুঃখ দাবি করে সর্বস্ব, সমগ্র ভুবন কেড়ে নেয়।

দুপুরে স্কুল থেকে ফিরে এসেছে টুকুন। ভাত খেয়ে আলাদা বিছানায় ঘুমুচ্ছে। বড় ঘাম হয় ছেলেটার। একটা মাত্র পাতলা জামা গায়ে, তবু জলধারায় ভেসে যাচ্ছে গলা বুক। কপালে মুক্তাবিন্দু, মণিকা নিচু হয়ে টুকুনের মুখ দেখে। সবাই বলে, ওর শরীরের গঠন আর চোখ দুখানা সঞ্জয়ের মতো। নিবিড় পিপাসায় দেখে মুখখানি, মণিকা ফিস্‌ফিস্‌ করে ডাকে।

—টুকুন।

টুকুন উত্তর দেয় না।

—ওঠ টুকুন।

টুকুন উত্তর দেয় না।

—ওরে টুকুন বেলা গেল। ওঠ।

টুকুনের উত্তর নেই। নিঃসাড়ে ঘুমোয় সে। নিশ্চিন্তে।

টুকুন ওঠ্‌রে, আয় দুজনে মিলে একটু কাঁদি। ডাক্তার বাসুর চেম্বারে ফোন করল মণিকা, পোস্ট অফিসে গিয়ে।

—ডক্টর বাসুর সঙ্গে কথা বলতে চাই।

—উনি দিল্লীতে আছেন।

—কবে ফিরবেন?

—কন্‌ফারেন্সে গেছেন। কাল কি পরশু ফেরার কথা।

—আমার যে ভীষণ দরকার।

—কী দরকার বলুন।

—দয়া করে বলবেন, ডাক্তার বাসু কিসের স্পেশালিস্ট।

ও পাশে লোকটা বোধহয় একটু হাসলো, বলল: ক্যান্সার।

—আমি কাল আবার ফোন করব। কোন সময়ে আসার কথা?

—সকালের ফ্লাইটে। তবে কিছু বলা যায় না, হয়তো আটকে যেতেও পারেন।

মণিকা সন্তর্পণে ফোনটি রেখে দেয়। বাসায় ফিরে দেখে সঞ্জয় শুয়ে আছে। উত্তর শিয়রে মাথা, পায়ের কাছে দক্ষিণের জানালা। শেষবেলার একটু রাঙা আলো এসে পড়ে আছে পাশে। সঞ্জয় চেয়ে আছে দক্ষিণের জানালা দিয়ে। অবিরল চেয়ে থাকে আজকাল। কথা বড় একটা বলে না। টুকুনকে আদর করে না, মণিকাকেও না।

শেষ চান্স-এ হলুদ বেলুনটা না ফাটলে কোথায় থাকত মণিকা আর কোথায়ই বা সঞ্জয়। মণিকা সঞ্জয়ের দিকে চেয়ে থাকে। পিপাসায় তার ঠোঁট নড়ে, তার দুচোখ জলে ভেসে যায়। অচেনা পুরুষের মতো বড়ো দুঃখ এসে দাঁড়িয়েছে দুয়ার খুলে। হাতে তার হাওয়া-বন্দুক, হলুদ বেলুনের মতো ঝুলে আছে। মণিকার হৃৎপিণ্ড বিদীর্ণ হবে, ভেঙে যাবে বুক।

মণিকা শব্দ করে কেঁদে ওঠে। অবাক হয়ে সঞ্জয় চোখ ঘোরায়।

—কী হয়েছে?

—পাষাণ, তুমি পাষাণ।

সঞ্জয় বুঝতে পেরে মাথা নাড়ে, শ্বাস ফেলে বলে—কেঁদো না, আমাকে বরং এখন থেকে একটা করে সিগারেট দিও রোজ।

মণিকা হঠাৎ মুখ তুলে বলে—সিগারেট আর সিগারেট! সংসারে সিগারেট ছাড়া তোমার আর কিছু চাওয়ার নেই?

—না—মাথা নাড়ল সঞ্জয়।

—পাষাণ, তুমি পাষাণ।

মণিকা কাঁদে, সঞ্জয় চুপ করে দক্ষিণের জানালা দিয়ে চেয়ে দেখে, টুকুন পাশের ঘরে ঘুমোয়।

অনেক কষ্টে ডাক্তার বাসুর সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করতে পারে মণিকা। সঞ্জয়কে নিয়ে একদিন হাজির হয় ছায়াচ্ছন্ন চেম্বারটায়। বাসু প্রবীণ ডাক্তার, বিচক্ষণ অভিজ্ঞ দুটি চোখ তুলে বললেন—কি হয়েছে? দেখি! বলে সঞ্জয়কে চেয়ারে বসালেন। আলো জ্বালালেন কয়েকটা, ঝুঁকে ওর মুখ দেখতে লাগলেন, ঘরের এক কোণে দাঁড়িয়ে থাকে মণিকা, হাওয়া-বন্দুক তুলেছে এক পাষাণ, দেয়াল ঘড়ি পেণ্ডুলামের মতো দোল খাচ্ছে, বুকের ভিতরটা এক হলুদ বেলুন, দাঁতে চিবিয়ে আজও রুমাল ছিঁড়লো মণিকা।

ডাক্তার বাসু সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বললেন—কিছু হয় নি।

—মানে? সঞ্জয় প্রশ্ন করে।

—যা সন্দেহ করে এসেছেন আমার কাছে, তা নয়। আজকাল সকলেরই এক ক্যান্সারের বাতিক, স্মোক করেন?

—করতাম।

—টন্‌সিলটা পাকা, ফ্যারিঞ্জাইটস্ আছে, সব মিলিয়ে একটা আলসার তৈরি হয়েছে, ওষুধ লিখে দিচ্ছি। সেরে যাবে।

ডাক্তারবাবু ওষুধ লিখে দিলেন।

সেরেও গেল সঞ্জয়।

একদিন বলল, শোনো মণিকা।

—কী?

—মনে আছে একবার মেলায় তোমাকে বাজি রেখে হাওয়া-বন্দুকের খেলা খেলেছিলাম?

—মনে আছে।

—সে জন্যে আমাকে ক্ষমা করো।

মণিকা হাসে—তুমি কি ভাবো, শেষ চান্সে বেলুনটা না ফাটলে আমি তোমাকে ছেড়ে চলে যেতাম?

—যেতে না?

—পাগল।

—কী করতে?

—আমি বন্দুকটা নিয়ে বেলুনটা ফাটাতাম। না পারলে সেফ্‌টিপিন ফুটিয়ে দিয়ে আসতাম বেলুনটায়!

—তুমি ডাকাত, বলে সঞ্জয় হাসে।

অলক্ষ্যে হাওয়া-বন্দুক নামিয়ে পরাজিত এক অচেনা পুরুষ ফিরে যায়। তার লক্ষ্যভেদ হল না। বিদীর্ণ হয় নি মণিকার হৃদয়। সব ঠিক আছে। কোনোদিন আবার সেই বন্দুকবাজ ফিরে আসবে। লক্ষ্যভেদ করার চেষ্টা করবে বার বার, একদিন লক্ষ্যভেদ করবেও সে। ততদিন পর্যন্ত পৃথিবীর এই রঙীন মেলায় আনন্দিত বাতাস বহে যাক্ এই কথা বলে—ঠিক আছে, সব ঠিক আছে।

আমি সুমন

আমি জানি, ভিনি আমাকে ভালবাসে। ভালবাসে বলেই ভিনি বার বার আমার কাছে ধরা পড়ে যায়; নাকি ইচ্ছে করেই ধরা দেয়, কে জানে। তার সঙ্গে প্রথম দেখা সেই শিশুবয়সে। তখন ও ফ্রক পরে, লালচে আভার এক ঢল চুল আর ঠোঁটের ওপরে বাঁ ধারে একটা আঁচিল, খুব ফর্সা রঙ—ব্যাস, আর কিছু মনে নেই।

প্রথম দিন, পনেরো ষোলো বছর পরে প্রথম দিন ভিনি আমার দিকে তাকালই না। কিংবা তাকিয়ে এক পলকেই সব দেখে এবং জেনে নিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে ভাল মানুষ সেজে গেল নিজের মার সামনে, কে জানে। বসল খাটের ওপর জানালার দিকে মুখ ফিরিয়ে আমার কাছ থেকে অনেক দূরে।

সুমন, এই হচ্ছে ভিনি। ওর মা বললেন, তাঁর চোখেমুখে অহঙ্কার ঝলমল করছিল, আরো অনেক নিঃশব্দ কথা ছিল তাঁর মুখে যা তিনি বললেন না, আমি বুঝে নিলুম—দেখ ত', আমার ভিনি কি সুন্দর হয়েছে। দেখো ওর আঙুল, ওর চুল, ওর মুখের ছাঁদ, কথা বলে দেখো-কী সুন্দর মিষ্টি ওর গলার স্বর, রাজপুত্রের যুগ্যি আমার ভিনি।

এই সব কথা ভিনির মায়ের মুখে লেখা ছিল কিংবা বলা ছিল। আমি বুঝে নিলুম। সঙ্গে সঙ্গে মনে মনে নিজের লজ্জা হচ্ছিল আমার। আমি তেমন কিছু হলুম না কেন। ভিনির বয়স হয়েছে বিয়ের, তবু কোনদিন ওর অভিভাবকেরা আমার কথা ভাববে না—আমি বুঝে গেলুম প্রথমদিনের কয়েক মিনিটেই। মনে মনে বললুম—পালা সুমন, মনে মনে যোগী ঋষি হয়ে যা। ছেলেবেলায় তুই যে সুন্দর ছিলি, একথা অনেকেই ভুলে গেছে। এখন কাঠুরের মতো চেহারা তোর, গুণ্ডাদের মতো ছোট করে ছাঁটা চুল, মুখের ভাব চোর-চোর, কাঠ হয়ে বসে আছিস।

কতদিন দেখা নেই! ভিনির মা বলে—কি করে আমাদের ঠিকানা পেলে?

সেটা আমার গুপ্ত কথা। তাই বললুম না, হেসে এড়িয়ে গেলুম। বুঝলুম ভিনি যে আমাকে তিনটে চিঠি লিখেছিল পর পর, তার কথা ওর বাড়ির

কেউ জানে না। তার প্রতিটিতেই লেখা ছিল—একবার আসবেন। আপনাকে বড় দরকার আমার। আমারও প্রশ্ন—আমার ঠিকানা ভিনি পেল কোথায়!

দরকারটা আমি বুঝতে পারছিলুম না, কেননা ভিনি জানালার বাইরে মুখ ঘুরিয়েই ছিল। অথচ পনেরো-ষোল বছর পর দেখা, তারও আগে দরকারের চিঠি দেওয়া!

চা খেয়ে আমি উঠে পড়লুম—চলি।

আবার আসবে তো? ভিনির মা বলল—আমরা আর তিন চার মাস কলকাতায় আছি। উনি রিটায়ার করলেন, হেতমপুরে ওঁদের দেশেই আমাদের বাড়ি তৈরী হচ্ছে, দু'তিনটে ঘরের ছাদ বাকী, ছাদ হলেই আমরা চলে যাবো। এর মধ্যেই এসো আবার। মা বাবা কেমন? বলে হাসলেন—কতদিন ওঁদের দেখি না।

হ্যাঁ আসবো বলেই বেরিয়ে আসছিলুম, মনে মনে তাগাদা দিচ্ছিলুম নিজেকে—পালা সুমন, ভীতুর ডিম, আর আসিস না কখনো।

সিঁড়িতে পা যখন দিয়েছি তখনই গলার স্বর শুনলুম—আমি অহংকারী নই।

এক ঝলক ফিরে দেখলুম—পিছনে সেই লালচে চুলের ঢল, আধো আলোতেও ঝলমল করছে মুখ। পাশে ওর মা দাঁড়িয়ে। তবু সঙ্কোচ নেই, কেবল ওর মায়ের মুখে একটু শুকনো ভাব আর জোর- করা হাসি।

পালালুম।

এতকাল আমি শান্তিতে ছিলুম। ছোট্ট একটা ঘর আমার। ছায়াময়, একটু গলির ভিতরের নির্জনে। সারাদিন প্রায়ই কথা না বলে কাটানো যেতো। লোকে আমার নাম জানে না, খুব কম লোকই আমাকে চেনে। আমি নিজের কাছেই নিজের সুমন। ভালবাসার, আদরের সুমন।

বাড়িওলার বৌ বলল—আপনার কাছে একজন এসেছিল।

—কে? অন্যমনস্ক আমি সিঁড়ি ভাঙতে ভাঙতে ঘাড় না ফিরিয়ে জিজ্ঞেস করলুম।

—সুন্দরমত একজন।

চমকে মুখ ঘুরিয়ে দেখি, বাড়িওলার বৌয়ের মুখে একটু সবজান্তা হাসি। ওঁর অনেক বয়স তবু হাসিটা সুন্দর দেখাল—মায়ের মতো হাসি।

দুটো সিঁড়িতে দু'পা রেখে দাঁড়িয়ে রইলুম।

—খুব সুন্দর। বাড়িওলার বৌ বলল—কে?

বুঝতে পারছিলুম। তবু জিজ্ঞাসা করতে ভয় করছিল—ছেলে না মেয়ে।

—ভাবসাব দেখে মনে হল, আবার আসবে। বাড়িওলার বৌ বলল—আমাদের ঘরে বসিয়ে রেখেছিলুম অনেকক্ষণ। চা করে খাইয়ে দিয়েছি। কথাবার্তা বেশী হয়নি, ভয় নেই।

ঘরে ঢুকে আলো জ্বাললুম না। অন্ধকারকে ডেকে বললুম—ধরা পড়ে গেছ।

রাতে শুতে গিয়ে কষ্টটা টের পেলুম। বুকে পেটে কিংবা কোথায় যে একটা বিশ্রী ব্যথা ছোট্ট একটা মাছের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে। ঘুম আসছিল না। কেবল ভয় আর ভয়। কিছু একটা আমি টের পাচ্ছিলুম।

আমি এইরকম।

খুব বড় একটা বাড়িতে অনেক অপোগণ্ড ছেলেমেয়েদের সঙ্গে আমার ছেলেবেলা কেটেছিল। তারা সব আমার জ্যেঠতুতো খুড়তুতো পিসতুতো ভাইবোন—অনাদরে রুক্ষ চেহারা তাদের, ঝাকড়-মাকড় চুল, গায়ে তেলচিট ময়লা, ঝগড়াটে, হিংসুটে। প্রকাণ্ড ঘরের মেঝেয় ঢালাও এজমালি বিছানায় শুতে যাওয়ার সময় তাদের জায়গা নিয়ে ঝগড়া হত। বাড়িটাকে বড় বললুম। কিন্তু হিসেবে ধরলে বাড়িটার এলাকাই ছিল বড়, বড় উঠোন ভিতরে, বাইরে বড় কচ্ছপের পিঠের মতো ঢালু একটা মাঠ। ভিতর বাড়িতে বড় উঠোন ঘিরে কয়েকখানা ঘর—যাদের নাম ছিল পুব পশ্চিম উত্তর বা দক্ষিণের ঘর। এক উত্তরের ঘর ছাড়া আর কোনো ঘরেরই পাকা ভিত ছিল না। আমাদের বাড়িটা যে লক্ষ্মীছাড়া ছিল, কিংবা আমাদের যে খুব অভাব ছিল, তা নয়। বরং উল্টোটাই আমাদের অনেক ছিল। শুধু আশ্রিত আত্মীয়স্বজন আর যৌথ থাকার চেষ্টায় যে ভিড় বেড়েছিল, তাইতেই বাড়িটার মধ্যে সব সময়ে ছিল একটা দিশেহারা ভাব। অনেক ছেলেমেয়ে ছিলুম আমরা, যাদের কেউ কেউ পরে অনেক বড় কিছু হয়েছে। কিন্তু অতগুলোর মধ্যে কখন কোনটার হাত-পা কাটল, কোনটা পড়ে মরল, কোনটা পুকুরে ডুবল-এই চিন্তায় একটা 'গেল গেল' ভাব সবসময়ে আমাদের বাড়িটায় টের পাওয়া যেত। আমার দাদুর কোনো ঢিলেমি ছিল না—তিনি সবসময়ে কৌটোর মুখ ভাল করে আটকাতেন, দরজার হুড়কো দিতেন ঠিকমতো, আর সন্ধেবেলা আমাদের গুণে গুণে ঘরে তুলতেন। মা-বাবার কাছে শোয়ার নিয়ম ছিল না, আমরা উত্তরের ঘরের মেঝেয় শুতুম একসঙ্গে, দাদু থাকতেন চৌকীতে, বিড়বিড় করে বীজমন্ত্র বলতেন দাদু ঠাকুমার সঙ্গে, ছোটখাটো

বচসা হত, আর ঘুম ভেঙে রাতে মাঝে মাঝে শুনতমু দাদুর গুড়ুক গুড়ুক তামাক খাওয়ার শব্দ।

আমাদের পরিবারে নাম রাখার একটা রীতি ছিল। আমার আগের ভাইদের নাম রাখা হয়েছিল অনিমেষ, হৃষীকেশ, পরমেশ, অজিতেশ, সমরেশ ....ইত্যাদি। সব মিলিয়ে প্রায় উনিশজনের ওরকম নাম রাখা হয়েছিল। আমার বেলায় আর নাম পাওয়া যাচ্ছিল না। শোনা যায় অনেক ভাবনা-চিন্তার পর আমার বড়দা রায় দিয়েছিলেন—মাত্র দুটি নাম বাকী আছে আর। সুটকেস আর সন্দেশ। কোনটা পছন্দ বেছে নাও। আমার ধর্মবিশ্বাসী মেজোকাকা আমার নাম দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন ধর্মেশ। সেটা বাতিল করে দাদু আমার নাম রাখলেন সুমনেশ। ভাল মনের অধিকারী। কেউ মুখে কিছু বলেনি কিন্তু অনেকেরই পছন্দ ছিল না নামটা, আমার মায়েরও না। তাই কালক্রমে আমি শুধু সুমন হয়ে উঠেছিলাম।

আমি সুমন। ভাল মনের অধিকারী।

ঐ বাড়িতে খুব বেশী বড় হয়ে ওঠবার আগেই আমরা বাড়ি ছেড়েছিলুম। আমার বাবা চাকরি নিয়ে চলে গেলেন বিহারে। প্রকাণ্ড বাগানঘেরা বাংলোবাড়িতে এসে আমার সেই পাঁচ সাত বছর বয়সে প্রথম হঠাৎ মনে হয়েছিল—আমার জীবন খুব একার হবে, না, হঠাৎ নয়। সেই বাড়িতে প্রথম সকালবেলায় আমি বাড়িটা ঘুরে ফিরে দেখতে ছুটে বেরিয়েছিলুম। একা। সামনে পপি ফুলের বাগান, তারপর ছোট মসৃণ লন, তারপর আগাছা আর রাঙচিতার বেড়া। আমি দৌড়োতে গিয়ে থমকে গেলুম—যত যাই ততই একা। কেবল একা। শিমুলগাছ থেকে হঠাৎ হু-হু করে কেঁদে উঠল একটা কোকিল। ওরকম ডাক আমি আর কোনদিন শুনলুম না। হাজার বছরে কোকিল বোধহয় ওরকম একবার ডাকে। আমি কি অনেক কোকিলের ডাক শুনিনি। তবু আমাদের দেশের এজমালি বাড়িতে অনেক অপোগণ্ড ছেলেমেয়ের ভিড়ে কখনো আমি কোকিলের ডাক শুনেছিলুম বলে মনে পড়ে না। একা ভোরের ভেজা বাগানে দাঁড়িয়ে আমি প্রথম একটি কোকিলকে ডাকতে এবং কাঁদতে শুনলুম। সেই মুহূর্তেই একা একটি কোকিল আর তার ডাকের সঙ্গে আমার মিলমিশ হয়ে গেল। মনে হল আমার জীবন খুব একার হবে। সেই ভোরবেলাটির কথা আজও আমার খুব মনে পড়ে। ঐ রকম একটি কোকিলের ডাক কিংবা আরো তুচ্ছ একটি দুটি ঘটনা থেকে আমরা আবার নতুন করে আমাদের যাত্রা শুরু করি। করি না! আমার এতদিনের বিশ্বাস ছিল—আমার জীবন খুব একার হবে।

আমি আমার বাবাকে সাদা জিনের প্যাণ্ট পরে ক্রিকেট টেনিস খেলতে দেখেছি। তবু বাবার ছিল সাধু-সন্ন্যাসী-জ্যোতিষ আর তুকতাকের বাতিক। খুব লম্বা সুন্দর সাদা চেহারার এক ভদ্রলোক, যার পরনে গেরুয়া আলখাল্লা আর চোখে সোনার চশমা, আমাকে দেখে বলেছিলেন—এ ছেলের স্বাভাবিক ছবি আঁকার হাত আছে। এর মন একটু দার্শনিক। বলে তিনি চুপ থেকেছিলেন।

বাবা প্রশ্ন করলেন—আর ?

উনি হেসে বললেন—একটু দেখে রাখবেন এ ঘর ছেড়ে পালাতে পারে। সন্ন্যাসের দিকে খুব টান।

—আর ? বাবার ভ্রূ কুঁচকে উঠল। দরজার আড়ালে মা ছিল। হঠাৎ তার হাতের চুড়ির ঝনাৎ শব্দ হয়েছিল। আমি বুঝেছিলুম, আমি সেই বয়সেই বুঝেছিলুম, লোকটা ভুল কথা বলছে না।

উনি একটু ভেবে বললেন, ওকে খুব সবুজের মধ্যে রাখবেন। ওর পোশাক যেন হয় সবুজ, ওর খাবারের মধ্যে বেশীর ভাগ যেন হয় সবুজ রঙের, ওর চিন্তায় সবুজের প্রভাব যেন বেশী থাকে দেখবেন।

তার পরদিনই রঙ সাবান কিনে এনে মা আমার সমস্ত পোশাক সবুজ করে তুলেছিল। রাশি রাশি শাকপাতা অনিচ্ছায় খেতে হত আমাকে। লুডো খেলতে বসেছি, মা ছুটে এসে বলত—সুমন-বাবা, তুই সবুজ ঘর নে। বাড়িতে পোষা বুলবুলি ছিল, তার পাশে এল একটা টিয়াপাখি। জন্মদিনে এক বাক্স জল রঙ কিনে দিয়ে মা বলল—কেবল গাছপালার ছবি আঁকবি।

তবু আমার জানা ছিল যে, আমার জীবন খুব একার হবে। সবুজ রঙের ভিতরেও একটি উদাসীন মমতা আছে। আমার মা কিংবা বাবা তা ধরতে পারেনি।

আমার চোখে চোখ রেখে শান্ত একটু হেসে ভিনি বলল—তারপর ?

—কি ?

—তোমার চোখ দেখলেই মনে হয়, কোথাও একটু বিপদের আভাস দেখলে তুমি হরিণের মতো ছুটে পালাবে। সুমন লক্ষ্মীসোনা, আমাকে ভয় পেও না। তোমার জন্য আমি অনেক কষ্ট করেছি।

আমি হাসলুম। কি জানি!

আমি সুমন। ভাল মনের অধিকারী। তবু আমি জানি ভিনির জন্য আমাকে কেউ ভাববেই না। ছেলেবেলা থেকেই ভিনি এরকম কথা শুনেছে তার

মা কিংবা আত্মীয়দের কাছে—সুন্দর ভিনি, তোমার জন্য এনে দেবো সোনার রাজপুত্তুর।

কিন্তু আমি কেবল সুমন। কেবলমাত্র সুমন। নিজের কাছে আমি নিজে বড় প্রিয়। আমি বরং পালিয়ে যাবো, লুকিয়ে থাকবো, পা টিপে হাঁটবো, লোকালয়ে যাবো না, তবু কেউ যেন কোনো কিছুর জন্য আমার অনাদর না করে, অপমান যেন না করে আমায়। বরং বলি—তোমাদের সুন্দর ভিনিকে নিয়ে যাও! আমি কিছুই চাই না। আমি আমার বড় আদরের সুমন, বড় ভালবাসার। আমার সামনে আমার সুমনকে অনাদর করো না, বাতিল করে ফেলে দিও না। বরং নিয়ে যাও তোমাদের সুন্দর ভিনিকে।

ভিনি আমার খুব কাছে এসে বলল—সুমন, মনে নেই? তোমার বাবার, সঙ্গে বেড়াতে গিয়ে তোমাদের বাড়িতে একদিন আর একরাত ছিলুম আমি। সন্ধেবেলা মায়ের কথা মনে পড়তে আমি খুব কেঁদেছিলুম। তুমি খেলার মাঠ থেকে ফিরে এসে আমার কান্না দেখে খুব খেপিয়েছিলে। মনে নেই? তখন তোমার দু'হাত তুলে নাচ, নকল কান্না আর মুখের কাছে মুখ এনে চোখ বড় করে তাকানো দেখে কান্না ভুলে আমি খুব হেসেছিলুম?

মনে নেই। হেসে বললুম—খেপিয়েছিলুম বলে আজো আমার ওপর রাগ পুষে রাখোনি তো ভিনি?

ও চোখ বুজে সোজা হয়ে বসে রইল, তারপর বলল—আমার গা দেখ।

দেখলুম গায়ে কাঁটা দিয়েছে।

ও চোখ বুজেই সামান্য হাসল, বলল—সেদিনের কথা মনে হলে আমার সমস্ত শরীর দিয়ে শিহরণ বয়ে যায়। ওরকম সুখ আমি আর কখনো পেলুম না।

শুনে একটু লজ্জা পেলুম। কখনো মানে ভিনি আজকের কথাও বলছে কি? কে জানে। মনে সন্দেহ এল, আমাকে কিশোর বয়সে যতটা ভাল লেগেছিল ভিনির ততটা আজও লাগে কি না। কিংবা হয়ত আজও ভিনি সেই কৈশোরের ভালবাসাই বহন করে চলেছে। কি জানি।

ভিনির দুই চোখ নিঃশব্দে কথা বলছিল—আমি তোমাকে ভালবাসি সুমন। আমি তোমাকে ভালবাসি।

ভিনি বড় সুন্দর। বড় ভালবাসে। আমার বুকের ভিতরে লাফিয়ে উঠল একটি বল। চোখে অকারণ জল আসছিল। মনে মনে বললুম—ভিনি সত্যি?

তিন সত্যি? দিব্যি? আমার গাঁ ছুঁয়ে বলো। দেখ ভিনি, আমি কিছুই না। আমি কেবলমাত্র সুমন। তাও এ নাম জানে মাত্র কয়েকজন লোক। তুমি এই নাম বুকে করে রেখেছিলে এতকাল? কেন গো? তিনটি চিঠি দিয়ে তুমি ডেকেছিলে আমায়—কি সত্যি? সত্যি বটে তোমার খেলামাটির রান্নাঘরে মাঝে মাঝে আমার নিমন্ত্রণ ছিল, পাথরকুঁচি পাতার লুচি আর কাদামাটির তরকারী আমি জিভ আর ঠোঁটের কৌশলে চক্‌চক্ শব্দ করে নকল খাওয়ার খেয়েছি, সত্য বটে, তোমাকে আমি দেখিয়েছিলুম দু'হাত তুলে বাঁদরনাচ কিংবা চোখের পাতা উল্টে ভয় দেখানোর খেলা। কিন্তু তারপর ক্রমে আমি তোমাকে ভুলেও গিয়েছিলুম। পনেরো ষোলো বছর পরের এই তোমাকে আমি চিনিই না। ভিনি, মা-কালীর দিব্যি, সত্যি বলো। তিন সত্যি। আমার পা ছুঁয়ে বলো!

ভিনি চলে গেলে রাতে আমার ঘুম এল না। আমার শরীরের ভিতরে একটিমাত্র যন্ত্রণার মাছ একা খেলা করে ফিরছে। কখনো পেটে, কখনো বুকে, কখনো মাথায়। ঠিক কোথায় যে তা বুঝতে পারি না। ঐ মাছ আমার সমস্ত শরীরে এবং চেতনায় একটিমাত্র কথাকে ছড়িয়ে দিচ্ছে—সুমন, তোমার জীবন বড় একার হবে।

আমি জানি। আমি তা জানি। অন্ধকারে আমি আপনমনে মাথা নাড়ালুম। তারপর চুপিচুপি আমার বালিশের কাছে বলে রাখলুম একটি নাম। ভিনি। ভিনি। ভিনি।

ছেলেবেলায় চেনা কিশোরীদের মুখগুলি আর মনে পড়ে না। কত নাম ভুলে গেছি। তবু মিতু নামে একটি মেয়ের সঙ্গে যে একটি-দুটি দুপুর আমি কাটিয়েছিলুম আমার কৈশোরে, তা মৃত্যু পর্যন্ত মনে থাকবে। আধো-অন্ধকার ছাদের সিঁড়িতে আমরা পাশাপাশি বসেছিলাম এক দুপুরে। ছাদের ওপর ঝড়ের মতো হাওয়ায় মড়্‌মড়্ করে নুয়ে পড়ছে এরিয়ালের বাঁশ, কলকাতার এঁটো বাসনের ওপর কাকদের হুড়োহুড়ি, নিচের ঘরে শীতলপাটিতে শুয়ে ভাতঘুমে মা, আর তখন আমার বুক কেঁপে উঠেছিল, আমরা কথা বলছিলুম না, মিতু খুব আস্তে আস্তে আমার আরো কাছ ঘেঁষে আসছিল। অনেক কাছে চলে এল মিতু, তার মুখ আমার মুখকে ছোঁয়-ছোঁয়। আমি সরে সরে গিয়ে রেলিঙের সঙ্গে সেঁটে গেছি, আমার বুক কাঁপছে, বুকের ভিতরে আমার সেই গলায় স্বর—পালা সুমন, রেলিঙ টপ্‌কে দেয়াল ডিঙিয়ে পালিয়ে যা, অনেক দূরে চলে যা। আমি টের পেয়েছিলুম তখন দেয়াল কেঁপে

উঠেছিল, কথা বলে উঠেছিল সিঁড়ি, মার মার শব্দে ছুটে আসছিল ছাদের বাতাস। মিতু টেরও পায়নি। মিতু বলেছিল—তোর মুখে কেমন ভাত খাওয়ার গন্ধ! রোজ খাওয়ার পর লুকিয়ে পান খাবি, কিংবা মৌরী, তারপর ফিক করে হেসে সে বলল—আমার মুখে একটা লবঙ্গ আছে, খাবি?

দাঁতে টিপে সে লবঙ্গর একটি কণা আমাকে দেখাল, বলল—নে, তোর দাঁত দিয়ে কাটে নে। নে না! বলে সে আমাকে টেনে নিল। সেই সময়ে, সেই নিতান্ত কৈশোরেও আমার মনে হয়েছিল আমি এক চারা গাছ, মিতু শিকড় সুদ্ধ আমাকে উপড়ে ফেলল।

আমাদের একটা ছোট্ট পুরোনো জিনিসপত্র রাখার জন্য ঘর ছিল। সেই ঘরে ছিল সবুজ রঙের একটা তোরঙ্গ। আমি আর মিতু সেই তোরঙ্গ এক দুপুরে খুলেছিলুম। তাতে ছিল বাণ্ডিল বাণ্ডিল পুরনো চিঠি—সেগুলো সবই আমার বাবার লেখা মাকে, কিংবা মার লেখা বাবাকে। আমি আর মিতু পাশাপাশি বসে সারা দুপুর পড়েছিলুম সেই সব চিঠি। তারপর আমরা দুজনে দিকে চেয়ে হেসেছিলুম। সবজান্তা হাসি। কিন্তু মা-বাবার ওপর অকারণে আমার বড় রাগ হয়েছিল। ইচ্ছে হয়েছিল আমি ওদের আর ভালবাসবো না। মিতু বলল, —তুই আমাকে চিঠি লিখবি? লেখ না। বানান ভুল করিস না, আর চিঠির ওপর ঠাকুর-দেবতার নাম লিখিস না। লিখবি তো? আমি বিকেলে এসে নিয়ে যাবো! তারপর তোকেও দেবো চিঠি।

সেই ঘটনার পর থেকে অনেক দিন আমি আমার বাবা-মার ওপর খুশী ছিলুম না। আমি বাগানে ঘুরে গাছেদের জিজ্ঞেস করতুম, আমি ঘরের দেওয়ালকে জিজ্ঞেস করতুম, রাতে স্বপ্ন দেখে ঘুম ভেঙে বুকজোড়া অন্ধকারকে জিজ্ঞেস করতুম, কেন আমি তাদের আর ভালবাসবো না?

মনে মনে আমি নিজেকে ডেকে বলেছিলুম—সুমন, তুই কখনো বিয়ে করিস না।

আমাদের বাড়িতে প্রায়ই জ্যোতিষেরা আসতো। তাদের মধ্যে একজন একবার বাবাকে বলেছিল—সুমনের বৌ যেন খুব সুন্দর হয়। কখনো কুচ্ছিৎ কিংবা চলনসই মেয়ের সঙ্গে ওর বিয়ে দেবেন না। সইতে পারবে না।

সেই জ্যোতিষ কী বলতে চেয়েছিল তা বুঝতে পেরে আমার সমস্ত শরীর শিউরে উঠেছিল। বুঝতে পেরেছিলুম আমার ভিতরে অন্যকে ভালবাসার

ক্ষমতা কত কম! শিশুর মতো রঙীন খেলনা দিয়ে ভুলিয়ে না রাখলে আমি সহজেই সব কিছুকে অবহেলা করবো।

মাঘ মাসের এক গোধূলি লগ্নে ভিনির সঙ্গে আমার বিয়ে হয়ে গেল।

সমারোহ কিছুই হল না। খুব আলো জ্বলল না, বাজনা বাজল না। প্রায় স্তব্ধতার ভিতরে আমি মন্ত্রোচ্চারণ করলুম।

বাসরঘরেও আমরা ছিলুম একা। ভিনি চুপিচুপি আমাকে বলল—বাব্বাঃ, বাঁচা গেল।

কেন? আমি জিজ্ঞেস করলুম।

ভিনি পরম নিশ্চিন্তে চোখ বুজে বলল—কি জানি, ভয় হচ্ছিল শুভদৃষ্টির সময়ে হয়ত দেখব অন্য লোক। তাহলে আমি ঠিক অজ্ঞান হয়ে পিঁড়ি থেকে পড়ে যেতুম।

হাসলুম—এত ভয়।

চোখ বুজে ভিনি একটা হাত বাড়িয়ে আমার বুকে রাখল, বলল—মন, তোমার বুকের ভিতরে পালিয়ে যাওয়ার দুরদুর শব্দ। বলেই হাসল ভিনি, তেমনি চোখ বুজে থেকে বলল—সেই কবে থেকে তোমাকে ভালবেসে আসছি মন, ভয় ছিল যদি পালিয়ে যাও! জানো না ত তোমার জন্য মা-বাবার সঙ্গে কত ঝগড়া করলুম আমি।

আমার মাথার ভিতরে গুনগুন করে ঘুরে বেড়াতে লাগল ভিনির ঐ কথাটুকু—কি জানি, ভয় হচ্ছিল শুভদৃষ্টির সময় হয়ত দেখব অন্য লোক।

আমি আস্তে আস্তে ভিনিকে বললুম—ভিনি, একটা কথা বলি?

—হুঁ।

—ছেলেবেলায় আমার মাকে কখন ভাল লাগত জানো? যখন রান্নাবান্না আর কাজ করতে করতে মার চুল এলোমেলো হয়ে যেত, মুখে জ্যাবজ্যাব করত ঘাম, সিঁদুর গলে নেমে আসত নাকের ওপর, যখন মার আটপৌরে শাড়িতে হলুদের দাগ, তখন মাকে আমি সবচেয়ে ভালবাসতুম। আর মা যখন সাজগোজ করত, গায়ে পরত ফর্সা জামাকাপড়, তখন মাকে বড় গম্ভীর আর রাগী দেখাতো যেন ছুঁতে গেলেই বকে দেবে। কিংবা মা যখন দুঃখ পেত, চুপ করে বসে থাকত, অথবা হয়ত কোনো কারণে কাঁদত তখনি, মা আমার সবচেয়ে প্রিয় ছিল, আমি কেবল মার আশেপাশে ঘুরঘুর করতাম। কেন বলো তো?

—কেন।

—আসলে একটু কষ্ট, একটু দুঃখের মধ্যেই মানুষকে দেখতে বোধ হয় আমার ভাল লাগে।

—পাগল। বলে ভিনি হাসল।

আমি একটু চুপ করে থেকে বললুম—আমার বাবাকে আমি সবচেয়ে বেশী কবে ভালবেসেছিলুম জানো?

কবে?

—মফঃস্বলে রেল-কলোনীর এক ক্রিকেট-ম্যাচে একটি লোক ছাব্বিশ রান করে আউট হয়ে গেল। বুড়ো স্কোরারের পাশে মাঠের ঘাসে বসে আমি দেখলুম সাদা পোশাক-পরা লম্বা চেহারার যুবকটি ক্রিজ ছেড়ে বেরিয়ে আসছে, মাথা অল্প নোয়ানো, হাতের ব্যাটটা শূন্যে একবার আধপাক ঘুরে গেল হতাশায়, মাথার টুপিটা খুলে নিয়ে ম্লান হাসি মুখে বাবা প্রকাণ্ড মাঠটা আস্তে আস্তে পার হয়ে প্যাভিলিয়নের তাঁবুর দিকে চলে যাচ্ছিল। সে জানত না যে সেই সময়ে মাঠের দর্শকের মধ্যে যে সবচেয়ে বেশী দুঃখ পাচ্ছিল তার জন্য, সে আমি। বাবা আউট হয়ে গেল বলে না, আসলে বাবার ঐ হেঁটে ফিরে আসা, আধপাক ঘুরে যাওয়া ব্যাটটার হতাশা আর মুখের হাসিটুকুর জন্য আমি কেঁদেছিলুম। তারপর থেকে বাবাকে যে আমি কি ভীষণ, ভীষণ ভালবাসি, ভিনি। এখনো যে বাবাকে ভালবাসি, তার কারণ বোধ হয় ঐ মুহূর্তটি, বাবার আউট হয়ে ফিরে আসার ঐ মুহূর্তটি। বাবা বলে ভাবতেই ঐ দৃশ্য আজও আমার চোখের সামনে স্পষ্ট ফুটে ওঠে। কেন বলো ত?

কেন?

আমি অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বললুম—আসলে দু' একটিই ভালবাসার মুহূর্ত থাকে আমাদের। না? বলেই হাসলুম—ছেলেবেলায় তুমি মাত্র একবারই ভালবেসেছিলে আমায়।

শুনে ভিনি অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল— আমি জানি তুমি আমাকে তেমন ভালবাসো না, সুমন। তেমন মুহূর্তে তোমার কখনো আসেনি।

শুনে বড় চমকে উঠলুম। হেসে বললুম—পাগলী।

ও চুপ করে আমার চোখের দিকে চেয়ে বলল—তাতে কিছু আসে যায় না। আমি তো তোমাকে ভালবাসি।

আমি হেসে গলা নামিয়ে বললুম—ভিনি, তোমার গায়ে জন্মদাগটা কোথায়?

অবাক হয়ে ভিনি বলল—কেন?

বললুম—তোমার গায়ের খোলা দাগটা খুঁজে পাইনি।

একটু চুপ থেকে ভিনি হঠাৎ লাল হয়ে মুখ ফিরিয়ে নিল—এঃ মাগো, বিচ্ছু কোথাকার....তোমার..... তোমারটা কোথায়?

তারপর অনেক রাতে ভিনি আমাকে তার জন্মদাগ দেখতে দিয়েছিল।

তিন বছরে আমাদের দুটি ছেলেমেয়ে হল। আর আমরা অল্প একটু বুড়ো হয়ে গেলুম।

মাঝে মাঝে আমি ভিনিকে বলি—ভিনি, আমার মন ভাল নেই।

—কেন?

—কি জানি।

—শরীর খারাপ নয়ত? বলতে বলতে সে এসে আমার কপালে তার গাল ছোঁয়ায়, বুকে হাত দিয়ে দেখে গা রকম কিনা।

—না, শরীর খারাপ নয়। আমি বলি।

—রাতে দুঃস্বপ্ন দেখেছিলে?

—না।

—তবে কি?

—কি জানি! আমি বলি—মন ভাল নেই।

ভিনি হাসে—পাগল কোথাকার।

—আমার বড় একা লাগছে, ভিনি।

ভিনি চমকে উঠে—কেন আমরা তো আছি।

আমি শূন্য চোখে চেয়ে থাকি। কথার অর্থ বুঝবার চেষ্টা করি। পকেট হাতড়ে খুঁজি সিগারেট আর দেশলাই।

গত আশ্বিনে আমি আমার চৌত্রিশের জন্মদিন পার হয়ে এলুম। আমি জানি আমি খুব দীর্ঘজীবী হবো—আমার কুষ্ঠিতে সেই কথা লেখা আছে। ত্রিশের ঘরে বসে আমি তাই সামনের দীর্ঘ জীবনের দিকে চেয়ে অলস ও ধীর স্থির হয়ে আছি। বিছানায় শুয়ে হাত বাড়ালেই যেমন টেবিলের ওপর সিগারেটের প্যাকেট, দেশলাই, জলের গ্লাস কিংবা ঘড়ি ছোঁয়া যায়, মৃত্যু আমার কাছে ততটা সহজে ছোঁয়ার নয়। মাঝে মাঝে জ্যোৎস্না রাতে

আমার ঘরের জানালা খুলে চুপ করে বসে থাকি। হালকা বিশুদ্ধ চাঁদের আলো আমার কোলে পড়ে থাকে। ক্রমে ক্রমে আমার রক্তের মধ্যে ডানা নেড়ে জেগে ওঠে একটি মাছ—ছোট্ট আঙুলের মতো একটি মাছ—শরীর ও চেতনা জুড়ে তার অবিরল খেলা শুরু হয়। আমার চেতনার মধ্যে জেগে ওঠে একটি বোধ, আমারই ভিতর থেকে কে যেন বড় মৃদু এবং মায়ের স্বরে ডাক দেয়, 'সুমন, আমার সুমন'। অকারণে চোখের জলে ভেসে যায়। আস্তে আস্তে জানালার চৌকাঠের ওপর মাথা নামিয়ে রাখি। মায়ের হাতের মতো মৃদু বাতাস আমার মাথা থেকে পিঠ পর্যন্ত স্পর্শ করে যায়। তখন মনে পড়ে—সুমন, তোমার জীবন খুব একার হবে।

উত্তরের ব্যালকনি

ব্যালকনিতে দাঁড়ালে লোকটাকে দেখা যায়। উল্টোদিকের ফুটপাথে বকুল গাছটায় অনেক ফুল এসেছে এবার। ফুলে ছাওয়া গাছতলা। সেইখানে নিবিড় ধূলোমাখা ফুলের মাঝখানে লোকটা গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে বসে আছে। গায়ে একটা ছেঁড়া জামা, জামার রঙ ঘন নীল। পরনে একটা খাকী রঙের ফুলপ্যান্ট—লজ্জাকর জায়গাগুলিতে প্যান্টটা ছিঁড়ে হাঁ হয়ে আছে। মাথায় একটা ময়লা কাপড়ের ফগ্‌গে জড়ানো। পিঙ্গল দীর্ঘ চুলগুলি আস্তে আস্তে জটা বাধঁছে। গালে দাড়ি বেড়ে গেছে অনেক, তাতে দুচারটে সাদা চুল। গায়ে চিট ময়লা, কনুইয়ে ঘা, তাতে নীল মাছি উড়ে বসে। এই হচ্ছে লোকটা। দু-পা ছড়িয়ে নির্বিকার বসে আছে, দুই চোখে অবিরল ক্লান্তিহীন তাকিয়ে থাকে। ঘা থেকে উড়ে মাছিগুলি চোখের কোণে এসে বসে। লোকটা দুহাত তুলে চেঁচিয়ে বলে—সরে যা, সরে যা, মেল ট্রেন আসছে।

পাগল।

সকালে ভাত খেয়ে একটা পান মুখে দেয় তুষার। সুগন্ধি জর্দা খায়। তারপর পিক ফেলতে আসে ব্যালকনিতে। ফুটপাথের ধারে কর্পোরেশনের ময়লা ফেলার একটি ড্রাম আছে। অভ্যাসে লক্ষ্য স্থির হয়। তুষার একটু ঝুঁকে দোতলায় ব্যালকনি থেকে সাবধানে পিক ফেলে। লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় না। পিকটা ঠিক গিয়ে পড়ে সেই ড্রামটায়। এদিক-ওদিক হয় না। অনেক দিনের অভ্যাস।

পিক ফেলে তুষার বকুলগাছের তলার সেই লোকটাকে দেখে। পাগল। তবু এখনো চেনা যায় অরুণকে। চেনা যায়? তুষার একটু ভাবে। কিন্তু অরুণের আগের চেহারাটা কিছুতেই সে মনে করতে পারে না। ফর্সা রঙ, ভোঁতা নাক, বড় চোখ—এইরকম কতগুলি বিশেষণ মনে পড়ে, কিন্তু সব মিলিয়ে চেহারার যে যোগফল—সেই যোগফলটাই একটা মানুষ—সেই মানুষটার নাম ছিল অরুণ—সেই অরুণকে কিছুতেই সব মিলিয়ে মনে পড়ে না। তবু তুষারের মনে হয়, এখনো অরুণকে চেনা যায়। কিন্তু আসলে

বোধহয় তা নয়। অরুণকে আর চেনা যায় না বোধহয়। তবু তুষারের যে অরুণকে চেনা মনে হয়, তার কারণ, গত পাঁচ বছর ধরে অরুণ ঐ গাছতলায় বসে আছে। ঐখানে বসে থেকে থেকেই তার চুল জট পাকাল, গালে দাড়ি বাড়ল, গায়ে ময়লা বসল—এই সব পরিবর্তন হল অরুণের। রোজ দেখে দেখে সেই পরিবর্তনটা অভ্যস্ত লাগে তুষারের। তাই অনেক পরিবর্তনের ভিতরেও আজও অরুণকে চেনা লাগে তার।

পাগলটা মুখ তুলে তুষারের দিকে তাকাল। তাকিয়েই রইল। আকীর্ণ ফুলের মধ্যে বসে আছে পাগল। তার চারদিকে শোষক নীল মাছি উড়ছে। পাগলটার চোখে এখন আর কিছু নেই। প্রথম প্রথম তুষার ঐ চোখে ঘৃণা, আক্রোশ, প্রতিশোধ—এই সব কল্পনা করত। ব্যালকনি থেকে তাড়াতাড়ি চলে আসত ঘরে, পারতপক্ষে ব্যালকনির দরজার খুলত না। কিন্তু আস্তে আস্তে তুষার বুঝে গেছে, পাগলটার চোখে কিছু নেই। কেবল অবিন্যস্ত চিন্তারাশি বয়ে যায় মাথার ভিতর দিয়ে, ওর চোখ কেবল সেই প্রবহমানতাকে লক্ষ্য করে অসহায় শূন্যতায় ভরে ওঠে। তুষার এখন তাই পাগলটার দিকে নির্ভয়ে চেয়ে থাকতে পারে। কোনো ভয় নেই।

পাগল মাতাল আর ভূত—অনেক ভয়ের মধ্যে এই তিনটের ভয় সবচেয়ে বেশী ছিল কল্যাণীর। তার বিশ্বাস ছিল, বাসার বাইরে যে বিস্তৃত অচেনা পৃথিবী, সেখানে গিজ্‌গিজ্‌ করছে পাগল আর মাতাল। আর চারপাশে যে অদৃশ্য আবহমণ্ডল, তাতে বাস করে ভূতেরা, অন্ধকারে একা ঘরে দেখা দেয়।

কোনো পাগলের চোখের দিকে কল্যাণী কখনো তাকায়নি। এখন তাকায়। ভয় করে না কি? করে। তবু অভ্যাসে মানুষ সব পারে।

পান খাওয়ার পর অভ্যাস মতো বাথরুমে গিয়ে মুখ কুলকুচো করে আসে তুষার। তারপর এক গ্লাস ঠাণ্ডা জল খায়। পানে খয়ের খায় না বলে ওর ঠোঁট লাল হয় না। তবু আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ভেজা তোয়ালে দিয়ে সাবধানে ঠোঁট মোছে তুষার। প্যান্ট শার্ট পরে। তারপর অফিসে বেরিয়ে যায়। যাওয়ার সময় অভ্যাস মতো বলে—সদরের দরজাটা বন্ধ করে দাও।

কল্যাণী সদর বন্ধ করে।

শোওয়ার ঘরের মেঝেতে বসে জলের গ্লাস রঙের বাক্স ছড়িয়ে কাগজে ছবি আঁকছে তাদের পাঁচ বছর বয়সের মেয়ে। সোমা এখনও কেবল গাছ লতাপাতা, আঁকে। আর আঁকে খোঁপাশুদ্ধু মেয়েদের মুখ। বয়সের তুলনায় সোমার আঁকার হাত ভালই। তার আঁকা গাছপালা, মুখ সব প্রায় একই

রকমের হয়, তবু মেয়েটা বিভোর হয়ে আঁকে। সারাদিন।

আজও লম্বা নিমপাতার মতো পাতাওয়ালা একটা গাছ আঁকছে সোমা। একটু দাঁড়িয়ে সেটা দেখল কল্যাণী। তারপর বলল—স্নান করতে যাবি না?

—যাচ্ছি মা, আর একটু—

মেয়ের ঐ এক জবাব।

—বড্ড অনিয়ম হচ্ছে তোমার। ঐ সব আজেবাজে এঁকে কী হয়?

—এই তো মা, হয়ে এল—বিভোর সোমা জবাব দেয়।

—সামনের বছর স্কুলে ভর্তি হবে যখন তখন দেখবে। সময় মতো স্নান খাওয়া, সময় মতো সব কিছু। এইসব তখন চলবে না—

বলতে বলতে কল্যাণী অলস পায়ে তুষারের স্নান-করা ভেজা ধুতিটা হাতে নিয়ে ব্যালকনিতে আসে।

যখন তুষার থাকে, তখন কখনো কল্যাণী ব্যালকনিতে আসে না। সারা সকাল রান্নাবান্নার ঝঞ্ঝাট যায় খুব, তুষারকে খাইয়ে অফিসে পাঠিয়ে কল্যাণী অবসর পায়। স্নানের আগে বাঁধা চুল খুলতে খুলতে অলস পায়ে এসে দাঁড়ায় ব্যালকনিতে। তাকায়।

আকীর্ণ ধুলোমাখা ফুলের মধ্যে বসে আছে পাগলটা। বসে আছে অরুণ। ব্যালকনিটা উত্তরে। গ্রীষ্মের রোদ পড়ে আছে। কল্যাণীর গায়ে রোদ লাগল, সেই রোদ বোধহয় কল্যাণীর গায়ে আভা নিয়ে ছুটে গেল চরাচরে। পাগলটা বকুল গাছের নিবিড় গাছের ছায়া থেকে মুখ তুলে তাকাল।

এখন কল্যাণী পাগলের চোখে চোখ রাখতে পারে। ভয় করে না। কি করে। তবু অভ্যাস। পাঁচ বছর ধরে পাগলটা বসে আছে ঐ বকুলগাছের তলায়। পাঁচ বছর ধরে উত্তরের এই ব্যালকনিটাকে লক্ষ্য করছে ও। ভয় করলে কি চলে।

কল্যাণী গ্রীষ্মের রোদে ব্যালকনির রেলিঙ থেকে তুষারের ভেজা ধুতিটা মেলে দেয়। তারপর দাঁড়িয়ে চুল খোলে, অলস আঙুলে ভাঙে চুলের জট।

পাগলটা তাকিয়ে আছে।

এখান থেকেই দেখা যায়, ওর ফাঁক হয়ে-থাকা মুখের ভেতরে নোংরা হলদে দাঁত, পুরু ছ্যাতলা পড়েছে। ঘুমের সময়ে নাল গড়িয়ে পড়েছিল বুঝি, গালে শুকিয়ে আছে সেই দাগ। দুর্গন্ধমুখের কাছে উড়ে উড়ে বসছে নীল মাছি।

ঐ ঠোঁট জোড়া ছ'সাত বছর আগে কল্যাণীকে চুমু খেয়েছিল একবার।

একবার মাত্র। জীবনে ঐ একবার। তাও জোর করে। এখন ঐ নোংরা দাঁতগুলোর দিকে তাকিয়ে সেই কথা ভাবলে বড় ঘেন্না করে।

দুপুর একটু গড়িয়ে গেলে ঠিকে ঝি মঙ্গলা এসে কড়া নাড়ে। তখন ভাতঘুমে থাকে কল্যাণী। ঘুম-চোখে উঠে দরজা খুলে দেয়। মঙ্গলা যখন রান্নাঘরের এঁটোটাকে মুক্ত করতে থাকে, তখন কল্যাণী রোজকার মতই ঘুমগলায় বলে—ভাতটা দিয়ে এসো।

নিয়ম। প্রথম যখন পাগলটা ঐ গাছতলায় এল তখন এই নিয়ম ছিল না। পাগল চীৎকার করত, আকাশ-বাতাসকে গাল দিত। চীৎকার করে হাত তুলে বলত টেলিগ্রাম...টেলিগ্রাম...! তখন ঘরের মধ্যে তুষার আর কল্যাণী থাকত কাঁটা হয়ে। পাগলটা যদি ঘরে আসে। যদি আক্রমণ করে। তারা পাপবোধে কষ্ট পেত। অকারণে ভাবত অরুণের প্রতি তারা বড় অবিচার করছে। কিন্তু আসলে তা নয়। অরুণকে কখনো ভালবাসেনি কল্যাণী, সে ভালবাসত তুষারকে। অরুণের সঙ্গে তুষারের তাই কোনো প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল না। তুষারের ছিল সহজ জয়। অরুণের ছিল পৃথিবী হারানো দুঃখ। সেই দুঃখ তার দুর্বল মাথা বহন করতে পারে নি। তাই লোভ, ক্ষোভ, আক্রোশবশত সে এসে বসল, তুষার কল্যাণীর সংসারের দোরগোড়ায়। চৌকী দিতে লাগল, চীৎকার করতে লাগল। সংসারের ভিতরে তুষার আর কল্যাণী ভয়ে সিঁটিয়ে থাকত, দরজা জানালা খুলতো না।

—চলো, অন্য কোথাও চলে যাই। কল্যাণী বলত।

—গিয়ে লাভ কী? ও ঠিক সন্ধান করে সেখানেও যাবে।

আস্তে আস্তে অভ্যাস হয়ে যাচ্ছিল। অরুণ গাছতলা পর্যন্ত এল। তুষার-কল্যাণীর সংসারের দোরগোড়ায় বসে রইল। কিন্তু আর বেশী এগোলো না। চীৎকার করত, কিন্তু কল্যাণীর নাম উচ্চারণ করত না, তুষারেরও না। লোকে তাই বুঝতে পারল না, পাগলটা ঠিক এখানেই কেন থানা গেড়েছে।

ভয় কেটে গেলে মানুষের মমতা জন্মায়।

তুষার একদিন বলল—ওকে কিছু খেতে দিও। সারাদিন বসে থাকে।

—কেন?

—দিও। ও তো কোনো ক্ষতি করতো না। বরং ওর ক্ষতি হয়েছে অনেক। আমরা একথালা ভাতের ক্ষতি স্বীকার করি না কেন!

সেই থেকে নিয়ম। কল্যাণী দুবেলা ভাত বেড়ে রাখে। ঠিকে ঝি দুপুর গড়িয়ে আসে। অ্যালুমিনিয়ামের থালায় ভাত, অ্যালুমিনিয়ামের গেলাসে

জল দিয়ে আসে। পাগলটা খিদে বোঝে। তাই গোগ্রাসে খায়, জল পান করে। অবশ্য খেতে খেতে কিছু ভাত ছড়িয়ে দেয়। কাকেরা উড়ে উড়ে নামে, চেঁচায়, নীল মাছির ভীড় জমে যায়। খাওয়ার শেষে পাগলটা এঁটো হাত নিশ্চিন্ত মনে জামায় মোছে। গাছের গুঁড়িতে মাথা হেলিয়ে ঘুমোয়।

ঘুমোয়! না, ঠিক ঘুম নয়। এক ধরনের ঝিমুনি আসে তার। আর সেই ঝিমুনির মধ্যে অবিরল বিচ্ছিন্ন চিন্তার স্রোত কুল কুল করে তার মাথার ভিতর দিয়ে বয়ে যায়। চোখ বুজে সে সেই আশ্চর্য স্রোতস্বিনীকে প্রত্যক্ষ করে।

মঙ্গলা আপত্তি করত—আমি ভিখিরির এঁটো মাজতে পারবো না, মা।

মাইনের ওপর তাকে তাই উপরি তিনটে টাকা দিতে হয়।

মঙ্গলা ভাত নিয়ে গিয়ে পাগলটার সামনে ধরে দেয়। তারপর একটু দূরে দাঁড়িয়ে উঁচু গলায় গাল পাড়ে—হাভাতে পাগল, রোজ ভাতের লোভে বসে থাকা! কপালও বটে তোর, এমন বাসার সামনে আস্তানা গাড়লি যে তারা তোকে সোনার চোক্ষে দেখল।

ভাতঘুমে রোজ কল্যাণী মঙ্গলার গাল শুনতে পায়!

আগে আলাদা ভাত যত্ন করে বেড়ে দিত কল্যাণী। ক্রমে সেই সব যত্ন কমে এসেছে। এখন তুষারের পাতের ভাত, সোমার ফেলে দেওয়া মাছের টুকরো, নিজের ভুক্তাবশেষ সবই অ্যালুমিনিয়ামের থালাটায় ঢেলে দেয়। পাগলটা সব খায়।

গত বছর একটা প্রমোশন হয়েছে তুষারের। জুনিয়ার থেকে এখন সে সিনিয়র একজিকিউটিভ। নিজের কোম্পানীর দশটা শেয়ার কিনেছে সে। ফলে সারাদিন তার দম ফেলার সময়ই নেই।

বিকেলের আলো জানালার শার্সিতে ঘরে আসে। তখন এয়ারকন্ডিশন করা ঘরখানায় সিগারেটের ধোঁয়া জমে ওঠে। কুয়াশার মতো আবছা দেখায় ঘরখানা। তখন খুব মাথা ধরে তুষারের। ঘাড়ের একটা রগ টিকটিক করে নাড়ে। অবসন্ন লাগে শরীর। সিগারেটে সিগারেটে বিস্বাদ, তেতো হয়ে যায় জিব। চেয়ার ছেড়ে উঠবার সময় প্রায় টের পায়, দুই পায়ে খিল ধরে আছে। চোখে একটা আঁশ-আঁশ ভাব।

অফিসের ছুটি হয়ে গেছে অনেকক্ষণ। কেবল বেকায়দায় আটকে-থাকা তার ছোকরা স্টেনোগ্রাফারটি তাড়াতাড়ি তার কাগজপত্র গুছিয়ে নিচ্ছে। ঘর ঝাঁট দিচ্ছে জমাদার। চাবির গোছা হাতে দারোয়ান এঘর ওঘর তালা দিচ্ছে।

দীর্ঘ জনশূন্য করিডোর বেয়ে তুষার হাঁটতে থাকে। নরম আলোয় সুন্দর করিডোরটিকে তখন তার কলকাতার ভূগর্ভের ড্রেন বলে মনে হয়।

বাইরে সুবাতাস বইছে। ফুটপাথে দাঁড়িয়ে এই প্রথম ফুসফুস ভরে বাতাস টানে সে। কোনো কোনো দিন এইখানে দাঁড়িয়েই ট্যাক্সি পেয়ে যায়। আবার কোনো কোনো দিন খানিকটা হাঁটতে হয়।

আজ ট্যাক্সি পেল না তুষার। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে তারপরে হাঁটতে লাগল।

একটা বিশাল বাড়ির কাঠামো উঠছে! দশ কি বারোতলা উঁচু লোহার খাঁচা। ইঁট কাঠ বালি আর নুড়ি পাথরের স্তূপ ছড়িয়ে আছে। নিস্তব্ধ হয়ে আছে কংক্রীট মিক্সার, ক্রেন হ্যামার উটের মতো গ্রীবা তুলে দাঁড়িয়ে। জায়গাটা প্রায় জনশূন্য। কুলিদের একটা বাচ্চা ছেলে পাথর কুড়িয়ে ক্রমান্বয়ে একটা লোহার বীমের গায়ে টং টং করে ছুড়ে মারছে! ঘন্টাধ্বনির মতো শব্দটা শোনে তুষার! শুনতে শুনতে অন্যমনস্ক হয়ে যায়।

ঐ তুচ্ছ শব্দটি—ঘন্টাধ্বনিপ্রতিম—তার মাথার মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। সে আবার ফিরে তাকায়। লোহার প্রকান্ড, ভয়ঙ্কর সেই কাঠামোর ভিতরে দিনশেষের অন্ধকার ঘনিয়ে উঠেছে। চারিদিক আকীর্ণ আবর্জনার মতো ইঁট কাঠ পাথরের স্তূপ। ঘন্টাধ্বনিপ্রতিম শব্দটি সেই অন্ধকার কাঠামোর অন্ধকারে প্রতিধ্বনিত হয়ে ছুটে আসছে।

ঐ শব্দ যেন কখনো শোনেনি তুষার। তার শরীরের অভ্যন্তরে অবদমিত কতগুলি অনুভূতি দ্রুত জেগে ওঠে। তীব্র আকাঙ্ক্ষা জাগে—ছুটি চাই, ছুটি চাই। মুক্তি দাও, অবসর দাও।

কিসের ছুটি! কেন অবসর! সে পরমুহূর্তেই অবাক হয়ে নিজেকে প্রশ্ন করে। কিন্তু উত্তর পায় না। প্রতিদিন নিরবচ্ছিন্ন কাজের মধ্যে ডুবে থাকা—এ তার ভালই লাগে। ছুটি নিলে তার সময় কাটে না। বেড়াতে গেলে তার অফিসের জন্য দুশ্চিন্তা হতে থাকে। কাজের মানুষদের যা হয়।

তবু সে বুঝতে পারে, তার মধ্যে এক তীব্র অনুভূতি তাকে বুঝিয়ে দেয়—কী রহস্যময় বন্ধন থেকে তার সমস্ত অস্তিত্ব মুক্তি চাইছে। ছুটি চাইছে। চাইছে অবসর। সে তন্ন তন্ন করে নিজের ভিতরটা খুজতে থাকে। কিছুই খুঁজে পায় না। কিন্তু তীব্র অজানা ইচ্ছা এবং আকাঙ্ক্ষায় তার মন মুচড়ে ওঠে।

আবার সে পিছন ফিরে সেই লোহার কাঠামো দূর থেকে দেখে। সেখানে অন্ধকার জমে উঠেছে। একটা বাচ্চা ছেলে অদৃশ্যে এখনো পাথর ছুঁড়ে মারছে লোহার বীমের গায়ে।

চৌরঙ্গীর ওপরে তুষার ট্যাক্সি পায়।

—কোথায় যাবেন?

ঠিক বুঝতে পারে না তুষার, কোথায় সে যেতে চায়। একটু ভাবে। তারপর দ্বিধাগ্রস্তভাবে বলে—সোজা চলুন।

গাড়ি সোজা চলতে থাকে দক্ষিণের দিকে, যেদিকে তুষারের বাসা। সেদিকে যেতে তুষারের ইচ্ছে করে না। বাড়ি ফেরা—সেই একঘেয়ে বাড়ি ফেরার কোনো মানে হয় না।

সে ঝুঁকে ট্যাক্সিওয়ালাকে বলে— সামনের বাঁদিকের রাস্তা।

এলগিন রোড ধরে ট্যাক্সি ঘুরে যায়।

কোথায় যাবো। কোথায়। তুষার তাড়াতাড়ি ভাবতে থাকে। ভাবতে ভাবতে মোড়ে এসে যায়। এবার? ভিতরে সেই তীব্র ইচ্ছা এখনো কাজ করছে। অন্ধকারময় একটা বাড়ির কাঠামো—লোহার বীমে নুড়ি ছুঁড়ে মারার শব্দ—তুষারের বুক ব্যথিয়ে ওঠে। মনে হয়—কেবলই মনে হয়—কী একটা সাধ তার পূরণ হয়নি। এক রহস্যময় অস্পষ্ট মুক্তি বিনা বৃথা চলে গেল জীবন।

সে আবার বলে—বাঁয়ে চলুন।

ট্যাক্সি দক্ষিণ থেকে আবার উত্তর মুখে এগোতে থাকে। আবার সার্কুলার রোড। গাড়ি এগোয়। ভিতরে ভিতরে ছট্‌ফট্‌ করতে থাকে তুষার।

একটা বিশাল পুরানো বাড়ি পেরিয়ে যাচ্ছিল গাড়ি। তুষার সেই বাড়িটাকে দেখল। কি একটা মনে পড়ি-পড়ি করেও পড়ল না। আবার বাড়িটা দেখল। হঠাৎ পাঁচ-সাত বছর আগেকার কয়েকটা দুরন্ত দিনের কথা মনে পড়ল। নিনি। নিনিই তো মেয়েটার নাম।

গাড়ি এগিয়ে গিয়েছিল, তুষার গাড়ি ঘোরাতে বলল।

সেই বিশাল পুরানো বাড়িটার তলায় এসে থামে গাড়ি।

হাতে সদ্য-কেনা এক প্যাকেট দামি সিগারেট আর দেশলাই নিয়ে সেই পুরানো বাড়ির তিন তলার সিঁড়ি ভেঙে উঠতে উঠতে তুষার ভাবে—এখনো নিনি আছে কি এখানে? আছে তো!

বাড়িটায় অসংখ্য ঘর আর ফ্ল্যাট। ঠিক ঘর খুঁজে পাওয়া মুশকিল। তার ওপর পাঁচ-সাত বছর আগেকার সেই নিনি এখনো এখানে আছে কিনা সন্দেহ। যদি না থেকে থাকে, তবে ভুল করে ঢুকে বিপদে পড়বে না তো তুষার?

একটু দাঁড়িয়ে ভেবে, একটু ঘুরে ফিরে দেখে তুষার ঘরটা চিনতে পারল। দরজা বন্ধ। বুক কাঁপছিল, তবু দরজায় টোকা দিল তুষার।

দরজা খুললে দেখা গেল, নিনিই। অবিকল সেইরকম আছে।

চিনতে পারল না, ভ্রূ তুলে ইংরিজিতে বলল—কাকে চাই?

তুষার হাসল—চিনতে পারছ না?

নিনি ওপরের দাঁতে নিচের ঠোঁট কামড়ে ধরে একটু ভাবল। তুষার দেখল ডান দিকের একটা দাঁত নেই। সেই দাঁতটা বাঁধানো, দাঁতের রঙ মেলে নি। পাঁচ বছরে অন্তত এইটুকু পাল্টেছে নিনি।

—আমি তুষার।

নিনির মুখ হঠাৎ উদ্ভাসিত হয়ে গেল।

এবার বাংলায়—আঃ, তুমি কি সেরকম দুষ্টু আছো! বুড়ো হওনি?

—আগে বলো, তুমি সেই নিনি আছো কিনা! তোমার স্বামী-পুত্র হয় নি তো! হয়ে থাকলে দোরগোড়া থেকেই বিদায় দাও।

নিনি ঠোঁট উল্টে বলল— আমার ওসব নেই। এসো।

ঘরে সেই রঙিন কাগজে ছাওয়া দেওয়াল, ভাড়া করা ওয়ার্ডরোব, মেয়েলি আসবাবপত্র। এখনো সেন্ট-পাউডার ফুলের গন্ধ ঘরময়। বিছানার মাথার কাছে গ্রামোফোন, টেবিলে রেডিও আর গীটার।

নিনি কয়েক পলক তাকিয়ে বলল—তুমি একটুও বদলাওনি।

—তুমিও।

কিন্তু তুষারের ভিতরের তীব্র ইচ্ছাটা এখনো অস্থির অন্ধের মতো বেরোবার পথ খুঁজছে। সে কি এইখানে তৃপ্ত হবে? হবে তো? উত্তেজনায় অস্থিরতায় সে কাঁপতে থাকে।

ওয়ার্ডরোবের পাল্লা খুলে সাবধানে গুপ্ত জায়গা থেকে একটা দামী মদের বোতল বের করে নিনি, তারপর হেসে বলে—এই মদ কেবল আমার বিশেষ অতিথিদের জন্য।

এই সবই তুষারের জানা ব্যাপার। ঐ যে গোপনতার ভান করে দামী বোতল বের করা ওটুকু নিনির জীবিকা। তুষারের মনে আছে নিনি বারবার তাকে এই বলে সাবধান করে দিত—মনে রেখো, এটা ভদ্র জায়গা। আর, আমি বেশ্যা নই। মাতাল হয়ো না, হুল্লোড় কোরো না।

তুষার হাসল। সে বারবার নিনির কাছে মাতাল হয়ে হুল্লোড় করেছে।

তুষার আজ মাতাল হওয়ার জন্য উগ্র আগ্রহে প্রস্তুত ছিল। একটুতেই হয়ে গেল। তখন তীব্র মাদকতাময় একটা গৎ গীটারে বাজাচ্ছিল নিনি।

ওঁৎ পেতে অপেক্ষা করছিল তুষার। বাজনার সময়ে নিনিকে ছোঁয়া বারণ। বাজনা থামলে তারপর—

ভিতরে তীব্র ইচ্ছেটা গীটারের শব্দে তীব্রতর হয়ে উঠেছে।

মুক্তি। সামনেই সেই মুক্তি। চোখের সামনে আবার সেই খাড়া বিশাল লোহার কাঠামোতে ঘনায়মান অন্ধকার, লোহার বীমে নুড়ির শব্দ।

বাজনা থামতেই বাঘের মতো লাফ দিল তুষার।

তীব্র আশ্লেষ-ইচ্ছা আনন্দময় আবরণ-উন্মোচন, তারই মাঝখানে হঠাৎ ব্যথায় ককিয়ে ওঠে নিনি—থামো, থামো, আমার বড় ব্যথা—

তুষার থামে—কী বলছ?

নিনি ঘর্মাক্ত মুখে ব্যথায় নীল মুখ তুলে বলে—এইখানে বড় ব্যথা—

পেটের ডান ধার দেখিয়ে বলে—গত বছর আমার একটা অপারেশন হয়েছিল। অ্যাপেন্ডিসাইটিস—

তুষারের স্খলিত হাত পড়ে যায়। পাঁচ বছরে অনেক কিছু নষ্ট হয়ে গেছে। সব কিছু কি আর ফিরে পাওয়া যায়?

সময় পেরিয়ে গেল, তুষার ফিরল না।

বিকেলে চুল বেঁধেছে কল্যাণী। সেজেছে। চায়ের জল চড়িয়েছিল, ফুটে ফুটে সেই জল শুকিয়ে এসেছে। গ্যাসের উনান নিভিয়ে কল্যাণী ব্যালকনিতে এসে দাঁড়াল। উত্তরে ব্যালকনি, উল্টোদিকে ফুটপাথে সেই বকুলগাছ, গাছতলায় ধুলো-মাখা আকীর্ণ ফুলের মধ্যে বসে আছে পাগলটা। একটু দূরে বসে একটা রাস্তার কুকুর পাগলটাকে দেখছে।

দৃশ্যটাকে করুণ বলা যায়। আবার বলা যায়ও না। অরুণকে নিয়ে এখন আর ভাববার কিছু নেই। এখন সে রাস্তার পাগল। মুক্ত পুরুষ।

এখন ব্যালকনিটা অন্ধকার। পিছনে ঘরের আলো। তাই রাস্তার থেকে কল্যাণীকে ছায়ার মতো দেখায়। পাগলাটা মুখ তুলে ছায়াময়ী কল্যাণীকে দেখে। টুপটাপ বকুল ঝরে পড়ে। অবিরল। পাগলটা হাত বাড়িয়ে ফুল তুলে নেয়। লম্বা নোংরা নখে ছিঁড়ে ফেলতে থাকে ফুল। রাত বাড়ছে। তার খিদে পাচ্ছে।

পুরানো বাড়িটার সিঁড়ি বেয়ে অনেকক্ষণ হল রাস্তায় নেমে এসেছে তুষার। কখনো নির্জন সেক্সপিয়ার সরণী, কখনো চলাচলকারী মানুষের মধ্যে চৌরঙ্গী রোড ধরে বহুক্ষণ হাঁটল সে। এখনো মাঝে মাঝে উঁচু বাড়ির

লোহার কাঠামোর ভিতরে ঘনায়মান অন্ধকার তার মনে পড়ছে, মাঝে মাঝে শুনতে পাচ্ছে নেপথ্যে কে যেন নুড়ি ছুঁড়ে মারছে লোহার বীমের গায়ে। তার মন বলছে এখানে নয় এখানে নয়। চলো, সমুদ্রে যাই। কিংবা চলো পাহাড়ে, ছুটি নাও। মুক্তি নাও। বৃথা বয়ে যাচ্ছে সময়।

কেন যে এই ভুতুড়ে মুক্তির ইচ্ছা? সে কী চাকরি করতে করতে ক্লান্ত? সে কী সংসারের একঘেয়োমি পছন্দ করছে না? কল্যাণীর আকর্ষণ সব কি নষ্ট হয়ে গেল?

বেশ রাত করে সে বাড়ি ফিরল।

সোমা ঘুমিয়ে পড়েছে। কল্যাণী দরজা খুলে মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

—মদ খেয়েছো?

—খেয়েছি।

—আর কোথায় গিয়েছিলে?

—কোথায় আবার?

কল্যাণী বিছানায় উপুড় হয়ে শুয়ে কাঁদতে থাকে।

ভারী বিরক্ত হয় তুষার—কাঁদছো কেন? মদ তো আমি প্রথম খাচ্ছি না! আমাদের যা স্ট্রেইন হয়, তাতে না খেলে চলে না—

কাঁদতে কাঁদতেই হঠাৎ তীব্র মুখ তোলে কল্যাণী—শুধু মদ! মেয়েমানুষের কাছে যাওনি? তোমার ঠোঁটে গালে শার্টে লিপস্টিকের দাগ—তোমার গায়ে সেন্টের গন্ধ—যা তুমি জন্মে মাখো না—

তুষার অপেক্ষা করতে লাগল। এখন অপেক্ষা করা ছাড়া কিছু করার নেই।

অনেকটা রাত হল আরো। বেশ পরিশ্রম করতে হল তুষারকে। তারপর রাগ ভাঙল কল্যাণীর। উঠে ভাত দিল।

বাইরে বকুল গাছের তলায় তখন পাগলটা অনেকগুলি ফুল নখে ছিঁড়ে স্তূপ করেছে। উগ্র চোখে সে চেয়ে আছে অন্ধকারে ব্যালকনিটার দিকে। ঘরের দরজা বন্ধ। তার খিদে পেয়েছে। মাঝে মাঝে সে চেঁচিয়ে বলছে—অন্ধকার। ভীষণ অন্ধকার। কোই হ্যায়।

সেই ডাক শুনতে পেল তুষার। খেতে খেতে জিজ্ঞেস করল—পাগলটাকে রাতের খাবার দাওনি?

—কী করে দেবো? রোজ মঙ্গলা রাতে একবার আসে খাবারটা দিয়ে আসত। আজ আসেনি, ওর ছেলের অসুখ।

—আমার কাছে দাও, দিয়ে আসছি।

—তুমি দেবে? অবাক হয় কল্যাণী।

—নয় কেন?

—শুধু দিয়ে আসা তো নয়! বাবুর খাওয়া হলে এঁটো বাসন নিয়ে আসতে হবে। পাগলের এঁটো তুমি ছোঁবে?

তুষার হাসল—তোমার জন্য ও অনেক দিয়েছে ওর জন্য আমরা কিছু দিই—

থালায় নয়, একটা খবরের কাগজে ভাত বেড়ে দিল কল্যাণী। তুষার সেই খবরের কাগজের পোঁটলা নিয়ে বকুল গাছটার তলায় এল।

পাগলটা তুষারের দিকে তাকালও না। হাত বাড়িয়ে পোঁটলাটা নিল। খুলে খেতে লাগল গোগ্রাসে।

একটু দূরে দাঁড়িয়ে দৃশ্যটা সিগারেট খেতে খেতে দেখতে লাগল তুষার।

—খাওয়া ছাড়া তুমি আর কিছু বোঝো না অরুণ?

পাগলটা মুখ তুলল না। তার খিদে পেয়েছে। সে খেতে লাগল।

—ঐখানে, ঐ ব্যালকনিতে মাঝে মাঝে কল্যাণী এসে দাঁড়ায়। তাকে দেখ না? তার বাঁ গালে সেই সুন্দর কালো আঁচিলটা এখনো মাছির মতো বসে থাকে —দেখ না? এখনো আগের মতোই ভারী তার চোখের পাতা, দীর্ঘ গ্রীবা, এখনো তেমনি উজ্জ্বল রঙ। চেয়ে দেখ না অরুণ?

পাগল গ্রাহ্যও করে না। তার খিদে পেয়েছে। সে খাচ্ছে।

আকাশে মেঘ করেছে খুব। তুষার মুখ তুলে দেখল। পিঙ্গল আকাশ, বাতাস থম ধরে আছে। ঝড় উঠবে। ঝড়বৃষ্টির রাতেও বাইরেই থাকবে পাগল। হয়তো কোনো গাড়ি বারান্দার তলায় গিয়ে দাঁড়াবে। ঝড় খাবে। আর অবিরল নিজের মধ্যবর্তী বিচ্ছিন্ন এক স্রোতস্বিনীকে করবে প্রত্যক্ষ।

—তোমার কোনো নিয়ম না মানলেও চলে, তবু কেমন নিয়মে বাঁধা পড়ে গেছো অরুণ। তোমার মুক্তি নেই?

ডাল তরকারীতে মাখা কাগজটা ছিঁড়ে গেছে। ফুটপাথের ধুলোয় পড়েছে ভাত। পাগল তার নোংরা হাতে, নখে খুঁটে খাচ্ছে। একটা রাস্তার কুকুর বসে আছে অদূরে, আর দুটো দাঁড়িয়ে আছে। তুষার চোখ ফিরিয়ে নিল।

ঘর অন্ধকার হতেই সেই লোহার কাঠামো, তার ভিতরকার ঝুঝুকো আঁধার আর একবার দেখা গেল। লোহার বীমের গায়ে নুড়ি পাথরের টুং টুং শব্দ। অবিরল অবিশ্রাম। বুকে খামচে ধরে মুক্তির তীব্র সাধ। কিসের মুক্তি? কেমন মুক্তি? কে জানে! কিন্তু তার ইচ্ছা উত্তপ্ত পারদের মতো লাফিয়ে ওঠে।

আকুল আগ্রহে সে আবার বাতি জ্বালে। কল্যাণী বলে—কী হল?

উত্তেজিত গলায় তুষার ডাকে—এসো তো, এসো তো কল্যাণী।

তারপর সে নিজেই হাত বাড়িয়ে মশারির ভিতর থেকে টেনে আনে কল্যাণীকে। আনে নিজের বিছানায়। কল্যাণী ঘেমে ওঠে। উজ্জ্বল আলোয় কল্যাণীকে পাগলের মতো দেখে তুষার, চুমু খায়, তীব্র আগ্রহে, রিরংসায় তাকে মন্থন করে। বিড়বিড় করে বলে—কেন তোমার জন্য ও পাগল? কী আছে তোমার মধ্যে? কী সেই মহামূল্যবান? আমাকে দিতে পারো তো?

বৃথা। সবশেষে ঘোরতর ক্লান্তি নামে।

এইটুকু আর কিছু নয়!

ওরা ঘুমোয়। বাইরে ঝড়ের প্রথম বাতাসটি বয়ে যায়। প্রথম বৃষ্টির ফোঁটাটি একটি পোকার মতো উড়ে এসে বসে পাগলটার ঠোঁটে। বসে বসে ঝিমোয় পাগল। তার রক্তবর্ণ চুলগুলি নিয়ে খেলা করে বাতাস। বিদ্যুৎ উদ্ভাসিত করে তার মুখ। তার মাথায় অবিরল বকুল ঝরিয়ে দিতে থাকে গাছ।

বহু উঁচু থেকে ক্রেন হ্যামারটা ধম করে নেমে আসে। চমকে উঠে বসে তুষার। বুকের ভিতরটা ধক্-ধক্ করতে থাকে। এত জোরে বুক কাঁপতে থাকে যে দুহাতে বুক চেপে ধরে কাতরতার একটা অস্ফুট শব্দ করে সে।

কিসের শব্দ ওটা? অন্ধকারে উঁচু উটের গ্রীবার মতো নিস্তব্ধ ক্রেন হ্যামারটা সে কোথায় দেখেছে? কবে? বাইরে ঝড়ের প্রচণ্ড শব্দ বাড়ি-বাড়ি কড়া নেড়ে ফিরছে। একা-একা উল্লাসে ফেটে পড়ছে ঝড়। সেই শব্দে মাঝরাতে ঘুমভাঙা তুষার চেয়ে থাকে বেভুল মানুষের মতো। বুক কাঁপে। আস্তে আস্তে মনে পড়ে একটা বিশাল লোহার কাঠামো তাতে ঘনায়মান অন্ধকার, উঁচু ক্রেন হ্যামার! অমনি ব্যথিয়ে ওঠে বুক। তীব্র মুক্তির ইচ্ছায় ছটফট করতে থাকে সে। তার মন বলে—চলো সমুদ্রে! চলো পাহাড়ে! চলো, ছুড়িয়ে পড়ি।

বুক চেপে ধরে তুষার। আস্তে আস্তে হাঁপায়।

বাইরে খর বিদ্যুৎ দিয়ে মেঘ স্পর্শ করে মাটিকে।

এই ঝড়ের রাতে তুষারের খুব ইচ্ছে হয়, একবার উঠে নিয়ে পাগলটাকে দেখে আসে।

কিন্তু ওঠে না। নিরাপদ ঘরে ভীরু গৃহস্থের মতো সে বসে থাকে। বাইরে

ভিখিরি, পাগলদের ঘরে ঝড় ফেটে পড়ে। তাদের ঘিরে নেমে আসে অঝোর বৃষ্টির ধারা।

পরদিন আবার বকুলতলায় পাগলকে দেখা যায়। অফিস যাওয়ার আগে পানের পিক ফেলতে এসে উত্তরের ব্যালকনি থেকে তাকে দেখে তুষার। একটু বেলায় কল্যাণী আসে। দেখে। অভ্যাস।

কাজের মধ্যে ডুবে থাকে। শীততাপ-নিয়ন্ত্রিত ঘরে তুষার মাঝে মাঝে অস্বস্তি বোধ করে। অফিসের পর বাদুড়ের পাখনার মতো অন্ধকার ক্লান্তি নামে চার ধারে। অনেক দূর হেঁটে যায় তুষার। ট্যাক্সিতে ওঠে, কোনোদিন ওঠে না। হেঁটে হেঁটে চলে যায় বহু দূর। কী একটা কাজ বাকী রয়ে গেল জীবনে! করা হল না! এক রোমাঞ্চকর আনন্দময় মুক্তি পাওয়ার কথা ছিল আমার। পেলাম না। অস্থিরতা বেড়ালের থাবার মতো বুক আঁচড়ায়।

মাঝে মাঝে রাতে ঘুম ভেঙে যায় তার। উঠে বসে। সিগারেট খায়। জল পান করে। কখনো বা উত্তরের দরজা খুলে ব্যালকনিতে এসে দাঁড়ায়। মোমবাতির মতো স্থির দাঁড়িয়ে আছে সাদা বাতিস্তম্ভ, তার নিচে বকুলগাছ তার ছায়া। অন্ধকারে একটা পুঁটলির মতো পড়ে আছে পাগল।

আবার ফিরে আসে ঘরে। বাতি জ্বালে। পাতলা নেট্-এর মশারির ভিতর দিয়ে তৃষিত চোখে ঘুমন্ত কল্যাণীকে দেখে। তার বুক ঘেঁষে জড়োসড়ো হয়ে শুয়ে আছে বাচ্চা সোমা। সোমার মাথার কাছে দুটো কাগজ, তাতে ছবি আঁকা। একটাতে নদী, নৌকো, গাছপালা। অন্যটাতে খোঁপাশুদ্ধু একটা মেয়ের মুখ, নিচে লেখা সোমা। অনেকক্ষণ ছবি দুটোর দিকে চেয়ে রইল তুষার। একটা শ্বাস ফেলল।

কল্যাণী শান্তভাবে ঘুমোচ্ছে। মুখে নিশ্চিত কমনীয়তা। চেয়ে থাকে তুষার। আস্তে আস্তে বলে—কী করে ঘুমোও?

—চলো, বাইরে যাই। কিছুদিন ঘুরে আসি। এক সকালে চায়ের টেবিলে কল্যাণীকে এই কথা বলল অবসন্ন তুষার।

—চলো। কোথায় যাবে?

—কোথাও। দূরে। সমুদ্রে বা পাহাড়ে।

—পুরীর সমুদ্র তো দেখেছি। দার্জিলিঙ শিলঙও দেখা।

—অন্য কোথাও। অচেনা নির্জন জায়গায়। বলে তুষার। কিন্তু সে জানে—মনে মনে ঠিক জানে—যাওয়া বৃথা। সে কতবার গেছে বাইরে,

সমুদ্রে, পাহাড়ে। তার মধ্যে মুক্তি নেই, জানে। মুক্তি এখানেই আছে। আছে দুর্লভ ইচ্ছাপূরণ। খুঁজে দেখতে হবে।

তবু তারা বাইরে গেল। এক মাস ধরে তারা ঘুরল নানা জায়গায়। পাহাড়ে, সমুদ্রেও। ফিরে এল একদিন।

পাগলটা ঠিক বসে আছে। উত্তরের ব্যালকনিটার দিকে চেয়ে।

মাঝে মাঝে কাজের মধ্যেও তুষার হঠাৎ বলে ওঠে—ন্‌নাঃ। বলেই চমকায়। কীসের না? কেন না?

ছোকরা স্টেনোগ্রাফারটিকে জরুরী ডিকটেশন দিতে দিতে বলে ওঠে—ন্‌নাঃ। স্টেনোগ্রাফারটি বিনীতভাবে থেমে থাকে।

তুষার চারদিকে চায়। অদৃশ্য মশারির মতো কী একটা ঘিরে আছে চারদিকে। ওটা কী! ওটা কেন! কী আছে ওর বাইরে?

নির্জন শেক্সপীয়ার সরণী ধরে হাঁটে তুষার, হাঁটে নির্জন ময়দানে, হাঁটে ভিড়ের মধ্যে। বহু দূরে দূরে চলে যায়। কিন্তু সেই অলীক মশারির বাইরে কিছুতেই যেতে পারে না। ট্যাক্সিতে উঠে বলে—জোরে চালাও ভাই। আরো জোরে...আরো জোরে...

ট্যাক্সি উড়ে যায়। তবু চারদিকে অলীক সূক্ষ্ম জাল।

হতাশ হয়ে ভাবে—আছে কোথাও বাইরে যাওয়ার পথ। খুঁজে দেখতে হবে। চোখ বুজে ভাবে। উটের মতো একটা ক্রেন হ্যামার আকাশে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে, পিছনে বিশাল লোহার কাঠামো, সেইখানে একটা লোহার বীমে নুড়ি ছুঁড়ে শব্দ তুলছে বাচ্চা একটা ছেলে।

এক-একদিন রাতে ভাত দিতে নেমে আসে তুষার। ভাত রেখে একটু দূরে দাঁড়ায়। সিগারেট খায়।

—অরুণ, তোমার কি ইচ্ছে করে আমার ঘরে যেতে?

পাগল খায়। উত্তর দেয় না।

—ইচ্ছে করে না কল্যাণীকে একবার কাছে থেকে দেখতে?

পাগল খায়। কথা বলে না।

—জানতে চাওনা সে কেমন আছে?

ফিরেও তাকায় না পাগল। খেয়ে যায়।

—একদিন তোমাকে নিয়ে যাবো আমাদের ঘরে। যাবে অরুণ?

একজন প্রতিবেশী পথ চলতে চলতে দাঁড়ায়। হঠাৎ বলে—আপনার

বড় দয়া। রোজ দেখি দু'বেলা পাগলটাকে আপনারা ভাত দেন। আজকাল কেউ এতটা করে না কারো জন্য। আমরা আমাদের ছেলে-মেয়েদের কাছে আপনার কথা বলি।

কৌতূহলে প্রশ্ন করে তুষার—কী বলেন।

—বলি, ঐরকম মহাপ্রাণ হয়ে উঠো। আমরা তো নিজেদের নিয়ে ব্যস্ত। আমাদের দ্বারা কিছু হল না পৃথিবীর। কাছাকাছি আপনি আছেন—এটাই আমাদের বড় লাভ।

তুষার মূক হয়ে যায়। এ কেমন মিথ্যা প্রচার! দয়া! দয়া কথাটা কেমন অদ্ভুত! এমন কথা সে তো ভাবেওনি!

কিন্তু ভাবে তুষার। ভাবতে থাকে। কাজকর্মের ফাঁকে ফাঁকে তেমনি বলে ওঠে—ন্‌নাঃ। চমকায়। জালবদ্ধ এক অস্থিরতায় অন্যমনস্ক হয়ে যায়। ঝড়বৃষ্টি হলে এখনো মাঝে মাঝে ক্রেন হ্যামারটা ধম করে নেমে আসে। জেগে উঠে যন্ত্রণার বুক চেপে কাতরতার শব্দ করে সে।

এক রাতে সত্যিই তুষার কল্যাণীকে ভাত বাড়তে বলে নিঃশব্দে সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেল। রাস্তা পার হয়ে এল বকুলগাছটার তলায়।

—চলো অরুণ। একবার আমার ঘরে চলো। কোনোদিন তুমি যেতে চাওনি। আজ চলো। আমি নিয়ে যাচ্ছি তোমাকে। আজ তোমার নিমন্ত্রণ।

বলে হাত ধরল পাগলের। পরিষ্কার সুন্দর হাতে ধরল নোংরা হাতখানা।

কে জানে কী বুঝল পাগল, কিন্তু উঠল।

সাবধানে তার হাত ধরে রাস্তা পার করল তুষার। সিঁড়ি বেয়ে উঠে এল। দাঁড়াল এসে খাবার ঘরের দরজায়।

—কল্যাণী, দেখ কাকে এনেছি।

কল্যাণীর হাত থেকে পড়ে গেল একটা চামচ। ভয়ঙ্কর ঠিন্‌ঠিন্‌ শব্দ হল। কেঁপে উঠল কল্যাণীর বুক। শরীর কাঁপতে লাগল। ভয়ে সাদা হয়ে গেল তার ঠোঁট।

—মা গো। চিৎকার করল সে।

নরম গলায় তুষার বলল—ভয় নেই, ভয় নেই কল্যাণী। তুমি খাবার সাজিয়ে দাও। অরুণ আজ আমার অতিথি।

নীরবে দাঁড়িয়ে রইল কল্যাণী। জলে তার চোখ ভরে গেল।

তুষারের হাতে-ধরা পাগল নতমুখে দাঁড়িয়ে রইল।

এত কাছে থেকে অরুণকে অনেকদিন দেখেনি কল্যাণী। কী বিপুল দারিদ্র্যের চেহারা। খালাসীদের যে নীল জামাটা ওর গায়ে, তা বিবর্ণ হয়ে

ছিঁড়ে ফালা-ফালা। খাকী প্যান্টের রঙ পাল্টে ধূসর হয়ে এসেছে। কী পিঙ্গল ওর ভয়ঙ্কর রাঙা চুল। পৃথিবীর সব ধুলো আর নোংরা ওর গায়ে লেগে আছে। কেবল তখনো অকৃপণ সুন্দর, সুগন্ধ বকুল ফুলে ছেয়ে আছে ওর মাথায় জটায় ঘাড়ে।

কাঁপা হাতে খাবার সাজিয়ে দিল কল্যাণী। তার চোখ দিয়ে অবিরল জল গড়িয়ে পড়ছে। পাগল তার দিকে তাকালই না। চোখ নিচু রেখে খেয়ে যেতে লাগল।

মাঝে মাঝে বিড়বিড় করে তুষার বলছিল—খাও অরুণ, খাও।

খাওয়া শেষ হলে তাকে আবার হাত ধরে তুলল তুষার। নিয়ে এল ঘরে।

—এই দেখ আমার ঘরদোর। ঐ যে মশারির নিচে শুয়ে আছে, ও আমার মেয়ে সোমা। এই দেখ, ওর হাতে আঁকা ছবি। এই দেখ ওয়ার্ডরোব, ফ্রিজিডেয়ার। ঐ ড্রেসিং টেবিল। এই দেখ, আরো কত কী...

ঘুরে ঘুরে অরুণকে সব দেখায় তুষার।

মাঝে মাঝে প্রশ্ন করে—এখানে এই সুন্দর ঘরে থাকতে ইচ্ছে করে না অরুণ? ইচ্ছে করে না এই সব জিনিসপত্রের মালিক হতে? তুমি আর চাও না কল্যাণীর মতো সুন্দর বৌ? সোমার মতো মেয়ে।

অরুণের হাতে জোর ঝাঁকুনি দেয় তুষার—বলো অরুণ, ইচ্ছে করে না?

—অন্ধকার? ভীষণ অন্ধকার! পাগল বলে।

—কোথায়—কোথায় অন্ধকার?

—এইখানে।

—বলে চারদিকে চায় পাগল।

—আর কোথায়?

—চারদিকে।

—থাকবে না অরুণ? থাকো থাকো। থেকে দেখ।

পাগল কিছু বলে না।

হতাশ হয়ে তার হাত ছেড়ে দেয় তুষার!

পাগলটা আস্তে আস্তে সদর পার হয়। সিঁড়ি ভাঙে। রাস্তা পেরিয়ে চলে যায় বকুলগাছটার তলায়। পা ছড়িয়ে বসে। গুঁড়িতে হেলান দেয়। কুলকুল করে বয়ে চলে তার অন্য লগ্ন চিন্তার স্রোতস্বিনী। চোখ বুজে অনাবিল আনন্দে সে সেই স্রোত প্রত্যক্ষ করে!

উত্তরের ব্যালকনিতে এসে দাঁড়ায় তুষার। চেয়ে দেখে নিশ্চিন্তে বকুল গাছের ছায়ার আবার বসেছে পাগল। টুপটাপ বকুল ঝরছে তার মাথায়।

উত্তরের ব্যালকনি থেকে দৃশ্যটা দেখে তুষার। তার দুই চোখ ভরে আসে জলে।

—কিছুই চাও না অরুণ? বকুলগাছের তলায় তোমার হৃদয় জুড়িয়ে গেছে! হায় পাগল, ভালবাসা নয়, এখন কেবল ভাতের জন্য তোমার বসে থাকা।

এখন আর কল্যাণীর কোনো সন্দেহ নেই। সে কাছে থেকে অরুণকে দেখেছে। সে কেঁপেছিল থরথর করে। দুঃখে ভয়ে উৎকণ্ঠায়। কিন্তু অরুণের মুখে সে দেখেছে বিস্মৃতি। তাকে আর মনে নেই অরুণের।

বড় শীত পড়েছে এবার। বকুল গাছ থেকে শুকনো পাতা খসে পড়ছে পাগলের গায়ে। ছেঁড়া জামা দিয়ে হু-হু করে উত্তরে হাওয়া লাগছে শরীরে। বড় দয়া হয়। মঙ্গলার হাত দিয়ে একটা পুরোনো কম্বল পাঠিয়ে দেয় কল্যাণী। পাগল সেই কম্বল মুড়ি দিয়ে নির্বিকার বসে থাকে।

মাঝে মাঝে কল্যাণীরও বুক ব্যথিয়ে ওঠে। ভালবাসার কথা মনে পড়ে। তুষার কি তাকে ভালবাসে এখনো! কে জানে? মাঝে মাঝে উগ্র রিরংসায় তাকে মন্থন করে তুষার। কখনো দিনের পর দিন থাকে নিস্পৃহ। আর, ঐ যে ভালবাসার জন্য পাগল অরুণ—ও বসে আছে ভাতের প্রত্যাশায়। কল্যাণীকে চেনেও না।

তাহলে কী করে বাঁচবে কল্যাণী? বুক খামচে ধরে এক ভয়।

আবার, বেঁচেও থাকে কল্যাণী। বাঁচতে হয় বলে।

মাথার ওপর সব সময়ে উদ্যত নিস্তব্ধ ক্রেন হ্যামারটাকে টের পায় তুষার। অস্বস্তি। কখন যে ধম করে নেমে আসে! অকারণে বুক কাঁপে। ব্যথায় ককিয়ে ওঠে তুষার।

ঠিক সকাল নটায় পিক ফেলতে এসে উত্তরের ব্যালকনি থেকে বকুল গাছটার গোড়ায় পাগলকে দেখে। দুজনে দুজনের দিকে চেয়ে থাকে।

কোম্পানী এবার উনিশ লক্ষ টাকা লাভ করেছে। ক্লান্তি বাড়ে। দিন শেষে তার শরীর জুড়ে নেমে আসে বাদুড়ের ডানার মতো অন্ধকার ক্লান্তি। তার ডালপালা ধরে কেবলই নাড়া দেয় এক তীব্র ইচ্ছা। নাড়া দেয়, নাড়া দিতে থাকে। অলীক ছুটি, মিথ্যা অবসর, অবিশ্বাস্য মুক্তির জন্য খামোকা আকুল হয় সে। পৃথিবী ঘুরে যাচ্ছে। বয়ে যাচ্ছে সময়। বয়স বাড়ছে।

তুষার অস্থির হয়। অস্থিরতা নিয়ে বেঁচে থাকে।

ঠিক যেন এক নদীর পাড়ে বসে আছে পাগল। কী সুন্দর আবছায়া নদীটি। চারদিকে আধো আলো আধো অন্ধকার। অনন্ত সন্ধ্যা। নদীটি বয়ে যায় অবিরল। স্মৃতি-স্মৃতিময় তার স্রোত। পাগল প্রত্যক্ষ করে। ক্লান্তি আসে না। বকুলের গাছ থেকে পাতা খসে পড়ে, কখনো ফুল। বৃষ্টি আসে, ঝড় বয়ে যায়, আবার দেখা দেয় রোদ। তবু আবছায়ায় নদীটি বয়ে যায়। বয়ে যায়।

পাগল বসে থাকে।

খগেনবাবু

নলতাপুরের বাসে ভিড়ের মধ্যে হঠাৎ সামনের দিকে খগেনবাবুকে দেখতে পেল দিগম্বর। অন্তরাত্মা পর্যন্ত চমকে উঠল। নলতাপুরের বাসে খগেনবাবু কেন? ইদিকে তো ওনার আসার কথাই নয়। তবে কি এত বছর বাদে খবর হয়েছে।

মেয়েদের সীটে এঁটে বসে আছে জুঁইফুল। সংক্ষেপে জুঁই। জায়গা নিয়ে একটু আগে ক্যাটর ক্যাটর করে ঝগড়া করেছে অন্য সব মেয়েমানুষদের সঙ্গে। তারা বলছে, জায়গা নেই। জুঁই বলছে, ঢের জায়গা, চেপে বসলেই হয়। সেই কাজিয়ায় দিগম্বর নাক গলায়নি। জুঁইয়ের গলার জোরের ওপর তার অগাধ বিশ্বাস। পারেও বটে মেয়েটা। সীটে গায়ে গায়ে মেয়েমানুষ বসা, সর্ষে ছড়ালেও পড়বে না এমন অবস্থা। তার মধ্যেই ঠিক ঠেলে গুঁতিয়ে জায়গা করে বসেছে। খুব আরামে না হলেও বসেছে তো। এখন দিব্যি ঘাড় ঘুরিয়ে চলন্ত বাস থেকে বাইরের দৃশ্য দেখছে।

জুঁইয়ের মুখোমুখিই প্রথমে দাঁড়িয়ে ছিল দিগম্বর। প্রাইভেট বাস, কণ্ডাকটর ঠেলে লোক তোলে, যতক্ষণ না বাসের পেট ফাটো-ফাটো হয়। ফলে লোকের চাপে ঠেলা খেতে খেতে অনেকটা সরে এসেছে সে। আরো সরত, সামনে একবস্তা গাঁটি কচু থাকায় ঠেকে গেছে। এখান থেকে জুঁই মাত্র হাত তিনেক তফাতে। কিন্তু মাঝখানে বিস্তর কনুই, হাত, জামা আর মাথার জঙ্গল থাকায় তিন হাতই এখন তিনশ হাত। আর বাসের মধ্যে চতুর্দিকে এমন গণ্ডগোল হচ্ছে যে, খুব চেঁচিয়ে না ডাকলে জুঁই শুনবেও না।

কিন্তু জানান দেওয়াটা একান্ত দরকার। একেবারে বাঘের ঘরে ঘোঘের বাসা দাঁড়াল কিনা ব্যাপারটা। আর কেউ নয়, স্বয়ং খগেনবাবুই বাসে সামনের দিকে।

একটু আগে জুঁই যখন চেঁচিয়ে ঝগড়া করছিল তখন তার গলা খগেনবাবুর কানে যায় নি তো। এতদিনে অবশ্য জুঁইয়ের গলার স্বর খগেনবাবুর ভুলে যাওয়ারই কথা। আর বাসের কে না চেঁচাচ্ছিল তখন? অত চেঁচামেচিতে কে কার গলা চিনবে।

সুবিধে এই যে, বাসে একেবারে গন্ধমাদন ভিড়। একটু আগেও দিগম্বর ভিড়ের জন্য কণ্ডাকটরকে দু কথা শুনিয়েছেন, পয়সাটাই চিনলে, মানুষের সুখদুঃখ বুঝলে না। আমাদের কি গরুছাগল পেয়েছো, নাকি তামাকের বস্তা? এখন অবশ্য দিগম্বর মনে মনে বলছে, ভিড় হোক, বাবা, বাসে আরো ভিড় হোক। গাড়ির পেট একেবারে দশমেসে হয়ে যাক।

খগেনবাবুকে দেখেই ঘাড়টা নামিয়ে ফেলেছে দিগম্বর। এখনো সেটা নোয়ানো অবস্থাতেই আছে। সুযোগ বুঝে পিছন থেকে কে যেন হাত ভেরে যাওয়ায় নিজের হাতব্যাগটা আলতো করে তার কাঁধে রেখেছে। অন্য সময় হলে খেঁকিয়ে উঠত, এখন কিছু বলল না। বরং ব্যাগটার আড়াল থাকায় একরকম স্বস্তি।

কিন্তু স্বস্তিটা বড় ঠুনকো। সানকিডাঙায় বেশ কিছু লোক নেমে যাবে, হত্তুকিগঞ্জে আজ হাটবার—সেখানে তো বাস একেবার সুনসান হয়ে যাওয়ার কথা, তবে উঠবেও কিছু সেখান থেকে। কিন্তু তা ওঠানামার ফাঁকেই খগেনবাবু যে পিছনে তাকাবেন না, এমন কথা হলফ করে কি বলা যায়? জুঁইকে একটু সাবধান করে দেওয়া দরকার। এদিকে তাকাচ্ছেও না। নতুন-নতুন কারণে অকারণে তাকিয়ে থাকত। পুরোনো হওয়ায় এখন আর চোখেই পড়ে না।

ভেবে একটু অভিমান হচ্ছিল দিগম্বরের। এই-যে সে ভালমানুষদের চাপে অষ্টাবক্র হয়ে গাঁটি কচুর বস্তায় ঠেক খেয়ে দাঁড়িয়ে আছে, তার জন্য 'আহা উহুঁ' করার আছে কে দুনিয়ায়?

কিন্তু অভিমানের সময় নেই। জানান দেওয়াটাই এখন ভীষণ দরকার। গলা তুলে ডাকতে পারছিল না দিগম্বর। খগেনবাবু শুনে ফেলবে। মাথায় একটা বুদ্ধি এল। জুঁইয়ের প্লাস্টিকের চটি-পরা একটা পা একটু এগিয়ে আছে। চেষ্টা করলে পা বাড়িয়ে জুঁইয়ের পা-টা হয়তো ছোঁয়া যায়।

কিন্তু চেষ্টা করতে গিয়ে যেই পা তুলেছে অমনি হড়াস করে কচুর বস্তায় বসা লোকটার কোলসই হয়ে গেল দিগম্বর। লোকটা খুন হওয়ার আগে যেমন মানুষে চেঁচায়, তেমনি চেঁচাতে থাকে, ওরে বাবারে! গেলাম! গেলাম!

দিগম্বর বুঝল, হয়ে গেছে। এই গোলমালে খগেনবাবু নিশ্চয়ই তাকাবে। সে মুখ তুলে ঠোঁটে আঙুল দিয়ে বলল, চুপ! চুপ!

লোকটা কোঁকাতে কোঁকাতেও তেজের সঙ্গে বলে, কেন চুপ করব? চুরি করেছি নাকি? কোথাকার ঢ্যামনা হে তুমি? ওপরের শিক ভাল করে ধরতে পারো না? ইত্যাদি আরো অনেক কথা।

কাঁকালে লেগেছিল দিগম্বরের। গাঁটি কচু যে বাসের ছাদেই ওঠানো উচিত, বাসের ভিতরে নয়, সে কথাটা তুলতে পারত। কিন্তু খগেনবাবুর ভয়ে বলল না কিছু।

ভেবেছিল, চেঁচামেচি শুনে সবাই তাকাবে। কিন্তু দাঁড়িয়ে উঠে বুঝল, চারদিকে হাটুরে গণ্ডগোলে ব্যাপারটা লোকে গ্রাহ্যই করেনি। জুঁইও আচ্ছা লোক বটে। সামনেই এত বড় কাণ্ড ঘটে গেল, একবার তাকাবে তো! তা নয়, জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে মাঠঘাট দেখছে।

বাস থামে। চলে। আবার থামে। দিগম্বরের দু'জোড়া চোখ থাকলে ভাল হত। তবু সাধ্যমতো সে খগেনবাবু আর জুঁইয়ের দিকে নজর রাখে। খগেনবাবুর কপালের বড় আঁচিলটা এখনো দিব্যি আছে। মাথার চুলে বাঁকা টেরী। গায়ে সেই একপেশে বোতামঘরওলা পাঞ্জাবি। জুঁই কালো রঙের মধ্যেই আরো ঢলঢলে হয়েছে। চোখ দুখানা আগের মতো চঞ্চল নয়। ধীরস্থির।

একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে দিগম্বর। পাপকাজ করলে ধরা পড়ার ভয়ও থাকে বটে। কিন্তু এই হাওড়া জেলার নলতাপুরের বাসে খগেনবাবুর দেখা পাওয়ার কথাই নয়। পেট থেকে একটা ভয়ের ভুড়ভুড়ি গলায় উঠে আসায় দিগম্বর একটা ঢেঁকুর তুলল।

জুঁইয়ের মাথার ওপর দিয়ে কে একজন জানলায় ভর দিয়ে দাঁড়িয়েছে! তার বগলটা জুঁইয়ের নাকের ডগায়। জুঁই দুর্গন্ধ পাওয়ার মতো নাক কুঁচকে মুখ তুলে বগলবাজকে কি যেন বলল। জয় মা! যদি এবার তাকায়!

তা তাকালও, কিন্তু ভিড়ের মধ্যে চিঁড়ে চ্যাপটা দিগম্বরকে চিনতে পারল বলে মনে হল না। আবার বাইরের দিকে মুখ ফিরিয়ে নিল। বগলবাজ ধমক খেয়ে তার বগল গুটিয়ে নিয়েছে। যত সব মেনীমুখো পুরুষ! বগলটা আর একটু রাখলে আবার তাকাত জুঁই।

সানকিডাঙা! সানকিডাঙা! দিগম্বরের পিলে চমকে দিয়ে চেঁচিয়ে উঠল কণ্ডাকটর।

বাস থেমেছে। হুড় হুড় করে লোক নামছে। দিগম্বর পাটাতনে উবু হয়ে বসে চোখ বুজে আছে। সর্বনাশ! বাস খালি হয়ে যাবে নাকি! নেমেই যাচ্ছে যে!

উবু হওয়ায় জুঁইয়ের চটির ডগাটা হাতের কাছে পেয়ে গেল সে। ভিড়ও অনেক কমেছে। হাত বাড়িয়ে একবার নাড়ল। কচুওয়ালা বড় বড় চোখে

দৃশ্যটা দেখছিল। কিছু বলতে মুখটা ফাঁকও করেছিল বোধহয়। কিন্তু তা দেখার অত সময় নেই দিগম্বরের।

জুঁই পা-টা পট করে টেনে নিয়েই সোজা তাকাল তার দিকে। বলল, ও কি গো ?

এমন সুযোগ আর আসবে না। দিগম্বর একটু হামা টেনে মুখটা কাছে নিয়ে বলল, বাসের সুমুখ দিকে খগেনবাবু। তাকিও না বোকার মতো। ঘোমটা টেনে মুখ ফিরিয়ে বোসো।

শুনে কেমনধারা ফ্যাকাশে মেরে গেল জুঁই। দুবার বলতে হল না। ফট করে ঘোমটা টেনে মুখ ঢাকা দিয়ে ফেলল।

সানকিডাঙায় নামল যত, উঠলও তত। আবার ঠাসা-চাপা গন্ধমাদন ভিড়। তবে দিগম্বর বসে ছিল, বসেই রইল। দু'একজন হাঁটুর গুঁত্তো দিয়ে অবশ্য দাঁড় করানোর চেষ্টা করছিল। বলল, দাঁড়াও ! দাঁড়াও ! বসলে জায়গা আটকে থাকে। দিগম্বর কাতর মুখ করে বলল, শরীর খারাপ। বড় বমি আসছে। শুনে লোকজন আর কিছু বলল না, বরং একটু যেন তফাতে চেপে থাকারই চেষ্টা করতে লাগল। কচুওয়ালা মহা ত্যাঁদড় । কিছু আঁচ করে মাঝে মাঝে শেয়ালের মতো চাইছে। দিগম্বর তার দিকে চেয়ে দেঁতো হাসি হেসে বলল, হত্তুকিগঞ্জের হাটে যাচ্ছো নাকি ? কচুওয়ালা দিগম্বরকে পাত্তা না দিয়ে অন্য দিকে চোখ ফিরিয়ে নেয়। ছোটলোক আর বলে কাকে।

বসে থেকে চারদিকে বাঁশবনের মতো লোকের পা দেখে দিগম্বর। পা দেখে কে কেমন লোক তা বোঝা যায় না। মুখ দেখে যায়। বেশীর ভাগ পা-ই প্যান্ট ধুতি পায়জামা আর লুঙ্গিতে ঢাকা। এর ফাঁক-ফোঁকর দিয়ে অবশ্য জুঁইকে দেখতে পাচ্ছে দিগম্বর। কাণ্ড দেখ। জুঁই গলা টানা দিয়ে ঘোমটা ফাঁক করে সামনের দিকে চাইছে মাঝে মাঝে। মেয়েমানুষ কোনকালে কথা শুনবে না। হাঁ-হাঁ করে ওঠে দিগম্বর, কিন্তু তার কথা জুঁইয়ের কানে যায় না।

বসে আরো কষ্ট। হাঁটু ঝিনঝিন করে এত টাইট মেরে বসে থাকায়। চারদিকে পা, তার ঠেলাও কম নয়। কচুর গাঁটটায় এক হাতে ভর দিতে গিয়েছিল, কচুওয়ালা তেরিয়া হয়ে বলল, ভর দেবে না। কচু থেঁতলে যাবে। দিগম্বর ফোঁস করে ওঠে, আর তুমি যে বসেছো কচুর ওপর। কচুওয়ালা তার জবাব দিল, আমার কচু। আমি বসব তোমার তাতে কি যায় আসে ?

বিপদে পড়লে সবাই মাথায় চড়ে। দিগম্বর আর কথা বাড়ায় না।

কখন যেন একটা মেয়েছেলে নেমে যাওয়ায় জুঁই একটু এগিয়ে এসে বসতে পেরেছে। এখন প্রায় দিগম্বরের মুখোমুখি। হঠাৎ ঘোমটায় ঢাকা মুখখানা নামিয়ে এনে বলল, কোথায় দেখলে? আমি দেখতে পাচ্ছি না তো।

দিগম্বর দাঁত কিড়মিড় করে। আহা, দেখার জন্য একেবারে আঁকুবাঁকু যে। দু'দুটো বউ পেরিয়েও ছেলেমেয়েদের ব্যাপারটা আজও ধাঁধাঁ লাগে দিগম্বরের। কি যে চায় তা ওরাই জানে।

সে চাপা ধমক দিয়ে বলল, আছে, আছে। ঘোমটা টেনে চুপ মেরে বসে থাকো। খবরদার তাকাবে না!

কচুওয়ালা সব শুনছে। ভারী লজ্জা লাগে দিগম্বরের।

ভুল দেখনি তো! জুঁই বলে।

জ্বলজ্যান্ত খগেনবাবু। ভীড় টপকে দেখবে কি করে? দাঁড়ালে দেখা যাবে।

একটু দাঁড়িয়ে দেখব?

আ মোলো! একজন বসা মেয়েমানুষের হাঁটুতে কপালটা ঠুকে গেল দিগম্বরের। বলল, পাগল হলে নাকি?

আহা, আমার তো ঘোমটা আছে। দেখব?

মরবে! বলছি, মরবে!

জুঁই আবার সোজা হয়ে বসে। দেখার চেষ্টা করে না ঠিকই। তবে বে-খেয়ালে ঘোমটা অনেক সরে গেছে।

হত্তুকির হাট! হত্তুকির হাট! কণ্ডাকটর গলা ফাটিয়ে চেঁচিয়ে ওঠে।

খগেনবাবু কোথায় নামবে, তা জানা নেই। কাঁটা হয়ে থাকে দিগম্বর। চারদিকে পায়ের যে ঘন বাঁশবন ছিল, তা এক লহমায় ফাঁকা-ফাঁকা হয়ে এল। হত্তুকির হাট জায়গাটা বড় ভয়ের। এখানেই সবচেয়ে বেশী লোক নামে। এমন কি কচুওয়ালা পর্যন্ত তার গাঁট কাঁধে তুলছে। সামনে একটা আড়াল ছিল। তাও গেল। গাঁট তুলতে তুলতে কচুওয়ালা কটমট করে তাকাচ্ছে তার দিকে। কিছু লোক আছে, কিছুতেই অন্য মানুষকে ভাল চোখে দেখে না।

দিগম্বর চোখ বুজে ভগবানকে বলছিল, খগেনবাবুর যেন এখানেই কাজ থাকে।

বেহায়া মেয়েছেলেটাকে দেখ। ঘোমটা প্রায় খসে পড়েছে। মুখখানা উদোম খোলা। গলা টানা দিয়ে প্রায় দাঁড়িয়ে সামনের দিকে তাকিয়ে দেখছে ড্যাবা

ড্যাবা চোখে। লজ্জার মাথা খেয়ে দিগম্বর জুঁইয়ের কাপড় ধরে টান দিল। চাপা গলায় বলল, বসে পড়ো!

জুঁইয়ের জ্ঞান ফেরে। ঘোমটা টেনে মুখ ঢাকা দেয়। তারপর কুঁজো হয়ে দিগম্বরকে বলে, দেখেছি।

দিগম্বর কটমট করে তার দিকে তাকায়। বলে, উদ্ধার করেছো। তোমাকে দেখেছে?

না, এদিকে তাকাচ্ছে না। সঙ্গে কারা আছে মনে হল। তারা বসে আছে বলে দেখা গেল না। আবছা যেন মনে হয়, বউ মতো কেউ। তার সঙ্গে কথা বলছে আর সিগারেট খাচ্ছে। বলেই জুঁই আবার সোজা হয় এবং ফের অবাধ্য হয়ে সামনের দিকে টালুকটুলুক চেয়ে থাকে।

বাসের মাথায় ধমাধম মাল চাপানোর শব্দ হচ্ছে। বিস্তর চেঁচামেচি। কাতারে লোক উঠছে ভিতরে। অনেক ধমক চমক অপমান সয়েও দিগম্বর বসেই থাকে। সামনে বাঁশগেড়ের খাল। পুরোনো পোল দু'বছর আগের বানে ভেসে গেছে। নতুন পোল তৈরি হচ্ছে সবে। ফলে বাস ওপারে যায় না। যাত্রীরা একটা বাঁশের সাঁকো পায়ে হেঁটে পেরিয়ে ওপাশে বাস ধরে। বাঁশগেড়েতে বাস থেকে নামলে কি হবে তাই ভাবে দিগম্বর, আর বিরক্ত চোখে জুঁইয়ের কাণ্ড দেখে! নতুন-নতুন যেমন তাকে অপলক চোখে দেখত, এখন ঠিক সেই চোখে সামনের দিকে চেয়ে খগেনবাবুকে দেখছে! মেয়েছেলেদের কি ভয়ভীতি নেই?

ভিড়টা আবার চেপে আসার পর বুকে আটকানো দম ছাড়ে দিগম্বর। জুঁই এখনো দেখছে। বিরক্তি কেটে এবার একটু মায়া হল দিগম্বরের। জুঁইকে দোষ দেওয়া যায় না। একসময়ে তো খগেনবাবুরই বিয়ে করা বউ ছিল জুঁই!

চার-পাঁচ বছর সুখেদুঃখে টানা ঘরও করেছে। তারপর না হয় পালিয়ে এসেছে দিগম্বরের সঙ্গে। তা বলে তো আর সব কিছুই ভুলে যাওয়া যায় না। দিগম্বরের সঙ্গে আছে মাত্র চার বছর, ভুলে যাওয়ার পক্ষে সময়টাও বেশী যায়নি। বাচ্চা-কাচ্চা হয়েছিল না ভাগ্যিস! হলে এতক্ষণে বোধহয় গিয়ে হামলে পড়ত।

জুঁই হঠাৎ আবার নিচু হল। বলল, সঙ্গের জন মেয়েছেলেই বটে, বুঝলে!

হোক না। দিগম্বর তেতো মুখে বলে।

মুখটা দেখতে পাচ্ছি না অবশ্য। নীল রঙের শাড়ি, জরির পাড়।

তোমাকে দেখে নি তো!

না। দুজনে খুব কথা হচ্ছে।

হোক। তুমি মুখ ঘুরিয়ে থাকো!

পান খেল এইমাত্র। জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে পিক ফেলতে দেখলাম। মেয়েছেলেটাই পান দিল।

দিক্ গে। অত দেখো না, ধরা পড়ে যাবে।

জুঁই ভ্রূ কুঁচকে বলে, মেয়েছেলেটা কে বলো তো! বউ নাকি?

কে বলবে! তুমিও যা জানো, আমিও তাই।

খুব বলত, আমি মরে গেলে নাকি আর বিয়ে করবে না।

আহা, তুমি তো আর মরে যাওনি!

মরার চেয়ে কম কি? মেয়েমানুষের কতরকম মরণ আছে, জানো?

জুঁই আবার সোজা হয়।

বাঁশগেড়ে এসে গেল বলে। বসে থেকেও বুঝতে পারে দিগম্বর। এইবার নামতে হবে। ভাবতে শরীর হিম হয়ে আসে। মাঝখানে শুধু পাথরগড়ে একটুখানি থামবে। তা সে পাথরগড়েই থামল বোধহয়। কারা যেন নামল সামনের দরজায়। এখানে বেশী লোক নামেও না, ওঠেও না। তাই নামবার তেমন হৈ-রৈ নেই। তবু বোঝা গেল কারা যেন নামছে। খগেনবাবুই কি?

জুঁইয়ের শাড়ি ধরে আবার একটু টান মারে দিগম্বর। জুঁই নিচু হয়।

কি বলছো?

কারা নামল?

কি করে জানবো? কত লোক নামছে উঠছে। কেন?

ওরা কিনা?

জুঁই ফিক করে এই বিপদের সময়ে একটু হাসেও। বলে, না। কর্তা বসার জায়গা পেয়েছেন। এদিকে পেছন ফেরানো। ভয় নেই। মেয়েমানুষটাকে কিছুতেই দেখতে পাচ্ছি না।

দেখতে চাইছ কেন?

দেখি না কিরকম।

ভালই হবে। খগেনবাবুর মেলা পয়সা। ভাল মেয়েছেলেই পাবে।

তুমিও তো খারাপ ছিলে না।

আমি তো কালো।

রংটাই কি সব?

জুঁই মুখ গোমড়া করে বলে, কর্তা অবশ্য কোনদিন কালো বলে নি। বরং বলত, মাজা রংই আমার পছন্দ।

এদিকে কোথায় যাচ্ছে বলো তো। দিগম্বর জিজ্ঞেস করে।

কি জানি।

আত্মীয়স্বজন কেউ নেই তো।

না। তবে শ্বশুরবাড়ি হতে পারে।

দূর্। এদিকে বিয়ে হলে সে-খবর আমি ঠিক পেতাম।

জুঁইয়ের কথা বলায় মন নেই। আবার সোজা হয়ে বসে দেখছে। মাঝে মাঝে দাঁড়িয়ে পড়ছে প্রায়।

এই করতে করতে বাসটা থেমে এল প্রায়। কণ্ডাক্টর ছোকরা তেজী গলায় চেঁচাল, বাঁশগেড়ে, বাঁশগেড়ে। বাস আর যাবে না।

ঘচাং করে বাসটা থামতেই হুড়ুম দুড়ুম লোক নামতে থাকে। জুঁই দাঁড়িয়ে পড়েছিল, দিগম্বর হাত ধরে টেনে বলল, দেখেশুনে, দেখেশুনে! জুঁই হাঁ করে চাইল দিগম্বরের দিকে, যেন চিনতেই পারছে না। চেয়ে থেকে থেকে হঠাৎ যেন চেতন হয়ে বলে উঠল, ফর্সা। খুব ফর্সা। বুঝলে!

কে?

বউটা।

হোক না। তাতে তোমার কি?

জুঁই মাথা নেড়ে বলে, কিছু না। বললাম আর কি।

সাবধানে মাথা তোলে দিগম্বর। ভিড়ের প্রথম চোটটা নেমে গেছে। ধীরে সুস্থে খগেনবাবু উঠল। ফর্সা মেয়েছেলেটাও। খগেনবাবু মেয়েছেলেটার কোল থেকে একটা বছর খানেকের খোকাকে নিজের কোলে নিল। বলল, সাবধানে নেমো।

জুঁই প্রায় চেঁচিয়েই বলে উঠল, খোকাটা দেখেছো! কী সুন্দর নাদুস নুদুস।

আর একটু হলেই খগেনবাবু ফিরে তাকাত। ধুতির খুঁটটা সীটের কোণে আটকে যাওয়ায় সেটা ছাড়াচ্ছিল বলে তাকিয়েও তাকাল না। সেই ফাঁকে পিছনের দরজা দিয়ে জুঁইয়ের হাত ধরে টেনে নেমে পড়ে দিগম্বর। বাসের পিছনে আড়াল হয়ে দাঁড়িয়ে খিঁচিয়ে ওঠে, তোমার মতলবখানা কী বলো তো! বুদ্ধি-সুদ্ধি লোপ পেল নাকি?

জুঁই হাঁ করে দিগম্বরের দিকে তাকায়। মেঘলা আকাশের ফ্যাকাশে আলোয় ওর মুখখানা দেখায় যেন ঘোরের মধ্যে আছে। চিনতে পারছে না দিগম্বরকে। অনেকক্ষণ সময় নিয়ে চিনতে পারল যেন। বলল, বিয়েই করেছে তাহলে।

করবে না কেন? দুনিয়ায় কে কার জন্য বসে থাকে?

জুঁই মাথা নেড়ে ভাল মানুষের মতো বলে, সে অবশ্য ঠিক কথা।

দিগম্বর উঁকি দিয়ে দেখল বহু মানুষ বাঁশের সাঁকো পেরোতে লাইন দিয়েছে। ভিড়ে ভিড়াক্কার। তার মধ্যে খগেনবাবু বা সেই ফর্সা মেয়েছেলেটাকে খুঁজে পাওয়া মুশকিল।

খানিকটা সময় ছাড় দিয়ে ধীরে ধীরে দিগম্বর আর জুঁই এগোয়। দেরি হয়ে গেছে। ওপারের বাসে আর বসার জায়গা পাবে না তারা। কিন্তু সে কথা কেউ ভাবছে না।

সাঁকোটা নড়বড় করে দোলে। মেলা লোকের পায়ের চাপে মড়মড় শব্দ উঠছে। কখন ভাঙে তার ঠিক নেই। খুব সাবধানে জুঁই আগে আগে, দিগম্বর তার পিছু পিছু সাঁকোতে ওঠে। নিচে ভর বর্ষার খাল গোঁ-গোঁ করে বয়ে যাচ্ছে। স্রোতের টানে সাঁকো থরথর করে কাঁপে। সবটাই ভালয় ভালয় পেরিয়ে একেবারে জমিতে পা দেওয়ার মুখে জুঁইয়ের পা ফসকাল।

উরে বাবাঃ! বলে টাল্লা খেয়ে পড়ে যাচ্ছিল সামনের দিকে কিন্তু গায়ে গায়ে মেলাই লোক। পড়বে কোথায়? তাই পড়ল না জুঁই। একজনের পিঠে ধাক্কা খেয়ে সেই পিঠেই হাতের ভর দিয়ে সোজা হয়ে উঠল।

একটা খোকা কেঁদে উঠল হঠাৎ। লোকটা মুখ ফিরিয়ে বিরক্ত গলায় বলল, দেখেশুনে চলবে তো মেয়ে! আর একটু হলেই ছেলেটা ছিটকে পড়ত।

জুঁই কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে। দিগম্বরের বুক হিম হয়ে যায়। লোকটা খগেনবাবু। কোত্থেকে যে উদয় হল হঠাৎ!

দুজনেই দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। কিন্তু দাঁড়িয়ে থাকবে তার সাধ্য কি? সাঁকোর সরু মুখে ঠেলাঠেলি দৌড়াদৌড়ি। কে আগে যাবে। তাই দুজনকেই এগোতে হল।

সামনেই খগেনবাবু যাচ্ছে। কোলের খোকাটা চুপ করে চেয়ে দেখছে পিছনবাগে।

ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ে দিগম্বরের। চাপা স্বরে বলে, চিনতে পারে নি।

জুঁই ফিরে চায়। তেমনি ভাবলা আনমনা মুখ। চোখের দৃষ্টিতে যেন সর পড়েছে। কিছু দেখছে না যেন।

কিছু বলছ?

বললাম, কপালটা ভাল। আমাদের চিনতে পারে নি।

বউটাকে দেখলে ভাল করে?

ও আর দেখব কি? রংটাই ফর্সা।

জুঁই মাথা নাড়ে, না মুখটাও সুন্দর।

থ্যাবড়া মুখ। তোমার মতো বড় বড় চোখ নয়।

তুমি তো ভয়ে চামচিকে হয়ে আছো, দেখলে কখন?

দেখেছি।

ছাই দেখেছো। বউটা সুন্দরীই।

আমার চোখে লাগল না।

জুঁই হঠাৎ চেঁচিয়ে ওঠে, ওমা। দেখ, ওরা মাঠের মধ্যে নেমে যাচ্ছে।

দুজনেই দাঁড়িয়ে যায়। কাঁচা সরু রাস্তায় লোকের ঠেলাঠেলি। বাসটা সামনেই দক্ষিণমুখো দাঁড়িয়ে। তার গায়ে লোকে গিয়ে পিঁপড়ের মতো জমাট বাঁধছে।

পথ ছেড়ে দুজনে ঘাস জমিতে সরে দাঁড়ায়। দেখে খগেনবাবু কোলে বাচ্চা আর পিছনে বউ নিয়ে মাঠের পথ ধরে পুবমুখো যাচ্ছে।

দিগম্বর বলল, এ জায়গা হল দীঘরে। পুবে গামছাডোবা। গামছাডোবাতেই যাচ্ছে তাহলে।

জুঁই তেমনি আচ্ছন্ন ঘোর ঘোর চোখে তাকিয়ে থেকে হঠাৎ আস্তে করে বলল, বেশ দেখাচ্ছে না?

বউ বাচ্চা নিয়ে খগেনবাবু মেঘলা আকাশের নিচে মাঠ পেরিয়ে গামছাডোবায় যাচ্ছে, তাতে সুন্দর দেখানোর কি আছে বোঝে না দিগম্বর।

দেরি করলে চলে না। বাস ছাড়বে এখুনি। নলতাপুরে জুঁইয়ের দেড় বছরের মেয়েটা বড় বউয়ের জিম্মায় আছে। বড় বউ আবার বেশীক্ষণ জুঁইয়ের বাচ্চা রাখতে হলে চেঁচামেচি করে। তার নিজেরই তিনটে।

দিগম্বর তাড়া দেয়, চলো চলো। দেরি হচ্ছে।

আঃ, দাঁড়াও না।

দাঁড়াবো! বলো কি? এরপর সেই সাড়ে সাতটায় লাস্ট বাস।

হোক্ গে।

তার মানে?

জুঁই কথাটা শুনতে পায় না। সামনে আদিগন্ত খোলা হা-হা করা মাঠে মেঘলা আলোর মধ্যে খগেনবাবু অনেকটা এগিয়ে গেছে। সাবধানে আল পেরোচ্ছে। বউয়ের হাতে একটা চামড়ার ছোটো স্যুটকেস।

কণ্ডাক্টর হাঁকাহাঁকি করছে জোর গলায়, নলতাপুর...নলতাপুর... চরণগঙ্গা।

দিগম্বর চেয়ে দেখে, বাসের বাইরে আর লোক পড়ে নেই। যে যেখানে পেরেছে, উঠে পড়েছে। ছাদে পর্যন্ত।

জুঁইফুল! কি হচ্ছে শুনি! দিগম্বর একটু আদর মিশিয়ে ডাকে।

জুঁই জবাব দেয় না। তবে বড় বড় চোখে তাকায়। এরকম তাকানো কোনো কালে দেখেনি দিগম্বর। আজই কেমনধারা একটা অন্যরকম দেখছে। ভূতে পেলে বোধহয় এমন হয়।

কিছু বলছ? আবার জিজ্ঞেস করে জুঁই। কিন্তু জবাব শোনার আগেই আবার মাঠের দিকে চেয়ে দেখে। ফিসফিস করে বলে, সত্যি বলছ চিনতে পারে নি?

বরাতজোর আর কাকে বলে! চিনলে রক্ষে ছিল না। একসময়ে তো খগেনবাবুর চামচাগিরি করতাম!

কিন্তু চিনল না কেন বলো তো!

ভুলে গেছে। মুখটা ভুলে গেছে।

তা কি হয়! আমি তো ভুলিনি। তবে কর্তা ভোলে কি করে?

দেখেইনি ভাল করে।

ধমকাল কিন্তু। মেয়ে বলে ডাকলো।

শুনেছি তো।

এত কাছে থেকে দেখেও না চেনার কথা তো নয়।

তুমিই বা বেছে বেছে ওর ঘাড়ে পড়তে গেলে কেন?

সে কি ইচ্ছে করে? পড়লাম, উঠে বুঝলাম একেবারে কর্তার পিঠের ওপর...ওঃ, গায়ের রোঁয়া দাঁড়িয়ে যাচ্ছে দেখ! কতকাল পর...

কি কতকাল পর?

সে তুমি বুঝবে না। কিন্তু এই বলে দিচ্ছি তোমায়, মেয়েমানুষটা যত ফর্সাই হোক, কর্তার চোখে ও রং ধরবে না।

তাই বা বলছ কি করে?

বলছি, জানি বলেই। কর্তার পছন্দ মাজা রং।

বিরক্ত হয়ে দিগম্বর বলে, না হয় তাই হল। এবার চলো তো। বাস ভেঁপু দিচ্ছে। কণ্ডাক্টর ঐ হাতছানি দিয়ে ডাকতে লেগেছে, দেখ চেয়ে।

দাঁড়াও না। এ বাসটা ছেড়ে দাও। পরের বাসে যাবো।

উরে বাস! বলো কি। সাড়ে সাতটা পর্যন্ত থাকব কোথায়? জল এলে দীঘরেতে মাথা বাঁচানোর জায়গা নেই!

আমি এখন যাবো না। দেখব।

কি দেখবে?

ওরা কতদূর যায়। একদম মিলিয়ে গেলে তবে যাবো।

কিন্তু বাস যে—

তাহলে তুমি একা যাও। আমি একটু দেখি।

বাস তাদের আশা ছেড়ে দিয়ে অবশেষে ছাড়ে। দিগম্বর অবশ্য যায় না। একটা হাই তুলে গাছতলায় গিয়ে বসে বিড়ি ধরায়।

জুঁই মেঘলা আলোর মাঠের দিকে তেমনি চেয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

দূরত্ব

মন্দার টেবিলের ওপর শুয়ে ছিল। থার্ড পিরিয়ড তার অফ্। মাথার নিচে হাত, হাতের নিচে টেবিলের শক্ত কাঠ। বুকের ওপর ফ্যান ঘুরছে। শরীরটা ভাল নেই কদিন। সর্দি। ফ্যানের হাওয়াটা তার ভাল লাগছিল না। কিন্তু বন্ধ করে দিলে গরম লাগবে ঠিক। শার্টের গলার বোতামটা আটকে সে শুয়ে ছিল। ক্রমে ঘুম এসে গেল। আর ঘুম মানেই স্বপ্ন, কখনো স্বপ্নহীন ঘুম ঘুমোয় না মন্দার।

স্বপ্নের মধ্যে দেখল তার বৌ অঞ্জলিকে। খুব ভীড়ের একটা ডবলডেকার থেকে নামবার চেষ্টা করছে অঞ্জলি। অঞ্জলির কোলে একটা কাঁথা-জড়ানো আঁতুড়ের বাচ্চা। নিচের মানুষরা অঞ্জলিকে ঠেলে উঠবার চেষ্টা করছে পিছনের মানুষরা নামবার জন্য অঞ্জলিকে ধাক্কা দিচ্ছে, চারিদিকের লোকেরা অঞ্জলিকে কনুই দিয়ে ঠেলছে, সরিয়ে দিচ্ছে, ধাক্কা মারছে, তার মুখখানা কাঁদো-কাঁদো, কোলের বাচ্চাটা ট্যাং-ট্যাং করে কাঁদছে, কোনদিকেই যেতে পারছে না সে। নামতেও না, উঠতেও না, বাচ্চাটা অঞ্জলির শরীর ভাসিয়ে বমি ক'রে দিল, পায়খানা করল, পেচ্ছাপ করছে। চারিদিকে রাগী, বিরক্ত, ব্যস্ত মানুষরা চেঁচাচ্ছে, গাল দিচ্ছে, যেন বাচ্চাশুদ্ধ অঞ্জলি জাহান্নামে যাক, না গেলে তারাই পাঠাবে। ঘুমের মধ্যেই মন্দার ভীড় ঠেলে অঞ্জলির কাছে যাওয়ার চেষ্টা করছিল আকুলভাবে। কিন্তু প্রতিটি লোকই পাথর। কাউকে ঠেলে সরাতে পারছে না মন্দার। সে চেঁচিয়ে বলছিল—আমি কিন্তু নেমে পড়েছি অঞ্জলি, তোমাকেও নামতে হবে-এ। নামো শিগগির নামো, বাস ছেড়ে দিচ্ছে। কিন্তু সেই স্বর এত দুর্বল যে, ফিস্‌ফিসের মত শোনা গেল। ক্রুদ্ধ কন্ডাক্টার ডবল ঘন্টি বাজিয়ে যাচ্ছে...অঞ্জলির কী যে হবে!

দুঃস্বপ্ন। চোখ খুলে মন্দার বুকের ওপর ঘুরন্ত পাখাটা দেখতে পায়। পাশ ফিরে শোয়।

অঞ্জলি এখন আর তার ঠিক বৌ নয়। মাস ছয়েক আগে মন্দার মামলা দায়ের করেছিল। আপসের মামলা। সেপারেশন হয়ে গেছে। অঞ্জলি যখন

চলে যায় তখন তার পেটে মাস দুয়েকের বাচ্চা। এতদিনে বোধহয় বাচ্চা হয়েছে, মন্দার খবর রাখে না। দেখে নি। ছেলে না মেয়ে, তা জানতে ইচ্ছেও হয় নি। কারণ, বাচ্চাটা তার নয়।

বিয়ের সাতদিনের মধ্যে ব্যাপারটা ধরতে পারল মন্দার। তখনই মাস দুয়েকের বাচ্চা পেটে অঞ্জলির। তা ছাড়া অঞ্জলির ব্যবহারটাও ছিল খাপাছাড়া। কথার উত্তর দিতে চাইত না, ভালবাসার সময়গুলিতে কাঁটা হয়ে থাকত। তবু দিন সাতেক ধরে অঞ্জলিকে ভালবেসেছিল মন্দার। মেয়েদের সংস্পর্শহীন জীবনে অঞ্জলি ছিল প্রথম রহস্য। দিন সাতেকের মধ্যেই বাড়িতে অঞ্জলিকে নিয়ে কথাবার্তা শুরু হয়। মন্দারের কানে কথাটা তোলে তার ছোটো বোন। শুনে মন্দারের জীবনে এক স্তব্ধতা নেমে আসে। অঞ্জলি অস্বীকার করে নি। মন্দার সোজা গিয়ে যখন অঞ্জলির বাবার সঙ্গে দেখা করে তখন সেই সুন্দর চেহারার বৃদ্ধটি কেঁদে ফেলেছিলেন, আত্মপক্ষ সমর্থনে একটিও কথা বলেন নি। শুধু বলেছিলেন—ওর সিঁথিতে সিঁদুরের দরকার ছিল, আমি সেটুকুর জন্য তোমাকে এই নোংরামিতে টেনে নামিয়েছি। ওকে তুমি ফেরৎ দেবে জানতাম। যদি একটি কথা রাখো, ওর ছোটো বোনের বিয়ে আর দু মাস বাদে, সব ঠিক হয়ে গেছে, শুধু এই কটা দিন কথাটা প্রকাশ কোরো না। মামলা তারপর দায়ের কোরো। আমি কথা দিচ্ছি, মামলা আমরা লড়বো না।

অঞ্জলি ফেরৎ গেল বিয়ের দশ দিনের মাথায়। দু'মাস অপেক্ষা করে মামলা আনে মন্দার। অঞ্জলি লড়ল না, ছেড়ে দিল। অঞ্জলির সঙ্গে আর দেখা হয় নি।

বিয়ের পর আট মাস কি ন'মাসে কেটে গেছে। মন্দার এখনও কেমন বেকুবের মতো স্তব্ধ হয়ে থাকে।

পাশ ফিরে শুতেই দেখা যায়, বইয়ের আলমারি। আলমারির ওপরেই উইপোকার আঁকাবাঁকা বাসা। সেদিকে চেয়ে থেকে স্বপ্নটা সে কেন দেখল তা মনে মনে নাড়াচাড়া করল একটু। আসলে স্বপ্নের তো মানে থাকে না। আর এ তো ঠিকই যে, অঞ্জলির কথা সে এখনো ভুলে যায়নি। এসব কি ভোলা যায়?

আজ মঙ্গলবার। আজই তার দুটো ক্লাশ। একটা সেকেন্ড পিরিয়ডে নিয়েছে, আর একটা ফিফথ্ পিরিয়ডে নেওয়ার কথা। এ সময়টায় কলেজে ক্লাশ বেশি থাকে না। পি. ইউ.-তে এখনো ছেলে ভর্তি হয়নি, পার্ট টু

বেরিয়ে গেছে। সপ্তাহে দু'দিন ছুটি থাকে তার, অন্য দিন একটা দুটো ক্লাশ নেয়, বাকি সময়টা শুয়ে থাকে। কেউ কিছু বলে না। সকলেই জেনে গেছে, মন্দার চ্যাটার্জির ডিভোর্স হয়ে গেছে, তার মন ভাল না, সে একটু অস্বাভাবিক মানসিকতা নিয়ে কলেজে আসে। এসব ক্ষেত্রে একটু-আধটু স্বেচ্ছাচার সবাই মেনে নেয়। মন্দার টেবিলে উঠে শুয়ে থাকলেও কেউ কিছু বলে না। থার্ড পিরিয়ড চলছে, ঘরে কেউ নেই, মন্দার একা। আবার ঘুমোতে তার ইচ্ছে করছিল না। ঐ ঘটনার পর কয়েকটা দিন খুবই অস্বাভাবিক বোধ করেছিল ঠিকই। বোধ হয়, তার সাময়িক একটা মাথা খারাপের লক্ষণও দেখা গিয়েছিল। কিন্তু এখন আর তা নয়। সময়, সময়ের মতো এমন সান্ত্বনাকারী আর কেউ নেই। মন্দারের মনে সময়ের স্রোত তার পলির আস্তরণ দিয়ে দিয়েছিল। আজ হঠাৎ ঐ দুঃস্বপ্ন।

বেয়ারাকে ডেকে এক পেয়ালা চা আনিয়ে খেল মন্দার। তারপর ছেলেদের খবর পাঠাল, ফিফ্‌থ পিরিয়ডের ক্লাশটা আজ সে করবে না। অনেকদিন ধরে বৃষ্টি নেই, বাইরে একটা চমকানো রোদ স্থির জ্বলে যাচ্ছে। বাইরে মন্দারের জন্য কিছু নেই। সম্পর্ক স্বাভাবিক হলে এতদিনে তার একটা বাচ্চা হতে পারত। আর তাহলে এখন মন্দার এই ক্লাশ ফাঁকি দিয়ে সেই শিশুটির কাছেই ফিরে যেত হয়তো বা সেই শিশুশরীরের গন্ধটি শ্বাসে টেনে নিতে।

এতবড় জোচ্চুরি যে টেঁকে না, তা কি অঞ্জলি জানত না? তার বাবাও কি জানত না? তবে তারা খামোখা কেন ঐ কাণ্ড করল? কেবল একটু সিঁদুরের জন্য কেউ কি একটা লোকের সারাজীবনের সুখ কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করে? কীরকম বোকামি এটা? দু'মাসের বাচ্চা পেটে লুকিয়ে রেখে বিয়ে—ভাবা যায় না, ভাবা যায় না।

স্বপ্নে-দেখা অঞ্জলির অসহায় ব্যথাতুর মুখখানার প্রতি যে সমবেদনা জন্মলাভ করেছিল, তা ঝরে গেল। জাগ্রত মন্দারের ভিতরটা হঠাৎ আক্রোশে রাগে উত্তপ্ত হয়ে উঠছিল। কিন্তু কিছু করার নেই। ট্রামে বাসে অচল আধুলি পেয়ে ঠকে যাওয়ার মতোই ঘটনা। কিছু করার থাকে না। অঞ্জলি আজও তার নামে সিঁদুর পরে কিনা, কে জানে।

মন্দার বেরিয়ে একটা ট্যাক্সি ধরল। গরমের দুপুর রাস্তা ফাঁকা। সে ট্যাক্সিটায় বসে ঘাড় এলিয়ে স্বপ্নটার কথা না ভেবে পারে না। ভিড়ের ভিতর একটা ডবলডেকার থেকে নামতে পারছে না অঞ্জলি, কোলের বাচ্চাটা

তার সারা শরীর ভাসিয়ে দিচ্ছে নিজের শরীরের আভ্যন্তরীণ ময়লায়, ক্লাথে। নিষ্ঠুর মানুষেরা অঞ্জলিকে ঠেলছে, ধাক্কা দিচ্ছে, গাল এবং অভিশাপ দিচ্ছে। এই স্বপ্নের কোনো মানে হয় না। অঞ্জলির সঙ্গে তার আর দেখা হয় নি। দেখা হওয়ার কথাও নয়। এখন সে কি তার প্রেমিকের ঘর করছে? কে জানে! স্বপ্নে মন্দার অঞ্জলিকে সেই ভীড় থেকে, অপমান লাঞ্ছনা আর বিপদ থেকে উদ্ধার করার চেষ্টা করেছিল। পারে নি। জাগ্রত মন্দার কোনোদিনই চেষ্টা করবে না।

ট্যাক্সিওয়ালাটা খোঁচায়। কেবলই ঘাড় ঘুরিয়ে জিজ্ঞেস করে—কোথায় যাবেন?

মন্দার বিরক্ত হয়ে বলে—সোজা চলুন, বলে দেবো।

কিছুক্ষণ দিক ঠিক করতে সময় গেল। কলকাতার কত অল্প জায়গা চেনে মন্দার! তার চেনা মানুষের সংখ্যাও কত কম। এখন এই ট্যাক্সিতে বসে কারো কথাই তার মনে পড়ে না যার কাছে যাওয়া যায়। কোনো জায়গাও ভেবে পায় না সে, যেখানে গিয়ে নিরিবিলিতে একটু বসে থাকবে। বাসায় ফেরার কোনো অর্থ নেই। সেখানে পলিটিক্যাল সায়েন্সের গাদাগুচ্ছের বইতে আকীর্ণ ঘরখানা বড্ড রসকষহীন। গত কয়েকমাস সেই বই সে প্রায় ছোঁয় নি। থিসিসের কিছু পাতা লেখা হয়েছিল, পড়ে আছে। ঘরে কেবল বিছানাটাই মন্দারের প্রিয়। যতক্ষণ ঘরে থাকে, শুয়েই থাকে মন্দার। ঘুমোয়, ভাবে, সিগারেট খায়। আজকাল কেউ ঘরে ঢোকে না ভয়ে।

ট্যাক্সিটা কিছুক্ষণ ইচ্ছেমতো এদিক-ওদিক ঘোরালো সে। তারপর অচেনা রাস্তায় এসে পড়ায় চিন্তিতভাবে এক জায়গায় গাড়িটা দাঁড় করিয়ে ভাড়া দিয়ে নেমে গেল।

কোথায় নেমেছে তা বুঝতে পারল না, তবু এ তো কলকাতাই! ঘুরেফিরে ডেরায় ফিরে যাওয়া যাবে। ভয় নেই। কিছুক্ষণ হাঁটলে বোধ হয় ভালই লাগবে।

অচেনা রাস্তা ধরে আন্দাজে সে হাঁটে। বুঝতে পারে, চৌরঙ্গীর কাছাকাছি অঞ্চল। নির্জন পাড়া, গাছের ছায়া পড়ে আছে, বাড়িগুলো নিঃঝুম। কয়েকটা দামী বিদেশী গাড়ি এধারে-ওধারে পড়ে আছে। মন্দার চম্‌কী রোদে কিছুক্ষণ হাঁটে। ভাল লাগে না, কেন ভাল লাগে না, তা বুঝতে পারে না। রোদ বড্ড বেশি। গরম লাগে, ঘাম হয়। শরীরের শ্রম মনের ভার লাঘবে কাজ করে না। মন জিনিসটা বড় ভয়ানক।

আসলে সে বুঝতে পারে, একবার অঞ্জলির সঙ্গে তার দেখা হওয়া দরকার গত ছ মাস ধরে বন্ধনমুক্ত মন্দার সুখী নয়। এই সুখী না-হওয়ার কারণ সে খুঁজে পায় না, পাচ্ছে না। সে ঠকে গিয়েছিল বলে আক্রোশ? তাকে একটা চক্রান্তের মধ্যে টেনে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল বলে ঘৃণা? সে অঞ্জলিকে ছুঁয়েছিল, ভালবেসেছিল বলে বিবমিষা? উত্তরটা অঞ্জলির কাছে একবার না গেলে ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। ডবলডেকারে পা-দানির ভিড়ে অঞ্জলিকে স্বপ্নে দেখার কোন মানে না থাক্, গত ছ'মাস মন্দার যে সুখী নয়, এটা সত্য। ভয়ঙ্কর সত্য। বিস্মৃতির পলি পড়েছে মনে, ক্রমে শান্ত হয়ে আসছে সে, এবং এইভাবেই একদিন হয়তো বা সে দার্শনিক হয়ে যাবে। কিন্তু তাতে সমস্যার সমাধান নেই। সে আবার বিয়ে করবে ঠিকই। মেয়ে দেখা হয়েছে। সামনের শ্রাবণে সে খুবই অনাড়ম্বর একটি অনুষ্ঠান থেকে তার নতুন স্ত্রীকে তুলে আনবে। কিন্তু তবু অসুখীই থেকে যাবে মন্দার। অঞ্জলির কাছে একটা রহস্য গোপন রয়ে গেছে।

অঞ্জলি দেখতে ভাল, অন্যদিকে খুবই সাধারণ। বি-এ পড়তে পড়তে বিয়ে হয়েছিল। খালি গলায় গাইতে পারত। রঙ চাপা, মাথায় গভীর চুল, ভীরু চাউনি ছিল। আর তেমন কিছু মনে পড়ে না। বিয়ের সাতদিন বাদে এক রাত্রিতে প্রায় উন্মাদ মন্দার জিজ্ঞেস করেছিল—তুমি প্রেগন্যান্ট?

অঞ্জলি ভীষণ ভয়ে আত্মরক্ষার জন্য দুটো হাত সামনে তুলে, ভীরু, খুব ভীরু চোখে চেয়ে বলেছিল—আমার বাবা এই বিয়ে জোর ক'রে দিয়েছেন, আমি চাই নি—

—তুমি প্রেগন্যান্ট কিনা বলো।

—হ্যাঁ।

—মাই গুডনেস্!

অঞ্জলি তবু কাঁদে নি, কেবল ভয় পেয়েছিল। কী হবে, তা অঞ্জলি বোধ হয় জানত। মন্দার যখন অস্থির হয়ে বারান্দায় দাঁড়িয়ে সিগারেট ধরাল, তখন ঘরে অঞ্জলির বাক্স গোছানোর শব্দ পেয়েছিল। অর্থাৎ অঞ্জলি ধরেই নিয়েছিল চলে যেতে হবে। মানুষ বরাবর এই সরে-যাওয়াটা বিশ্বাস করে।

ক্লান্ত মন্দার আবার একটা ফুটপাথের দোকান থেকে ভাঁড়ের চা খায়। গাছের তলায় কয়েকটা পাথর। তারই একটার ওপর, অন্যমনে বসে ভাঁড়টা শেষ করে। অঞ্জলির কাছে যাওয়াটা ভারি বিশ্রী হবে। ভাঁড়টা ছুঁড়ে ফেলে দেয় সে। অঞ্জলিদের বাড়িতে টেলিফোন নেই।

আবার একটা ট্যাক্সি নেয় মন্দার। এবার সে উত্তর কলকাতার একটা কলেজের ঠিকানা বলে ড্রাইভারকে। তারপর চোখ বুজে পড়ে থাকে। নন্দিনীর সঙ্গে দেখা করার কোনো মানে নেই। তবু এখন একটা কিছু বড় দরকার মন্দারের। কী যে দরকার, তা ঠিক জানে না। নন্দিনীর সঙ্গে তার পূর্ব পরিচয় নেই। বিয়ের সম্বন্ধ হয়েছে পারিবারিক যোগাযোগে।

নন্দিনীকে পেতে একটুও কষ্ট হল না। ক্লাশ ছিল না বলে কমনরুমে আড্ডা দিচ্ছিল। বেয়ারা ডেকে দিয়ে গেল।

মন্দারকে দেখে নন্দিনী ভীষণ অবাক। লোকটা কী ভীষণ নির্লজ্জ! সামনের শ্রাবণে বিয়ে, তবু দেখ তার আগেই কেমন দেখা করতে এসেছে!

—আপনি?

—আমি মন্দার।

—জানি তো।

—একটু দরকারে এলাম, ক'টা কথা বলতে।

—কী কথা?

—আমার প্রথমা স্ত্রীর সম্পর্কে।

—সেও তো জানি।

—ওঃ।

—আর কিছু?

—না, আর কিছু নয়। ভেবেছিলাম, বুঝি তোমাকে আমাদের বাসা থেকে কিছু জানানো হয় নি।

—আপনি ওটা নিয়ে ভাববেন না। আমি ভাবি না।

মন্দার নন্দিনীকে একটু দেখে। চোখা চেহারার মেয়ে। খুব বুদ্ধি আছে মনে হয়। বুদ্ধি ছাড়া অন্য কোনো জলুষ নেই। রঙ ফর্সা, লম্বাটে মুখ, ছোটো নাক। আল্‌গা সৌন্দর্য কিছু নেই।

মন্দার বলল—কিছু মনে করলে না তো!

নন্দিনী হাসে—এই কথা বলার জন্য আসার কোনো দরকার ছিল না। আজকাল চড়া রোদ হয়।

—ট্যাক্সিতে এসেছি।

অযথা খরচ।

—আমার খুব একা লাগছিল।

নন্দিনী একটু মাথা নিচু করে ভাবল। নন্দিনীর সঙ্গে মন্দারের মাত্র

একবার দেখা হয়েছিল পাত্রী দেখতে গিয়ে। বিয়ে অবশ্য ঠিক হয়ে গেছে, তবু এতদূর মন্দার না করলেও পারত। তার লজ্জা করছিল।

নন্দিনী মুখ তুলে আস্তে বলল—আমার এখন অফ্ পিরিয়ড চলছে, শেষ ক্লাশটা পলিটিক্যাল সায়েন্সের—ওটা তো না করলেও চলবে।

—না করলেও চলবে কেন?

নন্দিনী একটু হেসে বলে—পলিটিক্যাল সায়েন্সে ফেল করব না।

মন্দারও একটু হাসে। বলে—তাহলে তো তোমার ছুটিই এখন?

—মনে করলেই ছুটি।

—কোথায় যাবে?

—আমি কি জানি। যদি কেউ নিয়ে যেতে চায়।

খুবই চালু মেয়ে তার ভাবী বৌ। এত চালু মন্দার ভাবে নি। ওর ভঙ্গি দেখে বোঝা যায়, ও খুব কথা বলে। বেশ বুদ্ধির কথা, চটপট কথার জবাব দিতে পারে, রসিকতা করতে জানে, সাধারণ লজ্জা সংকোচ ওর নেই। পাত্রী দেখতে গিয়ে এতটা লক্ষ্য করে নি মন্দার। তখন অভিভাবকদের সামনে হয়তো অন্যরকম হয়ে ছিল। একে সঙ্গে নিতে ইচ্ছে করছিল না মন্দারের। কথা নয়, চুপচাপ পাশে বসে থাকবে, এমন একজন সঙ্গী দরকার তার। যার মন খুব গভীর, যার স্পর্শ-কাতরতা খুব প্রখর। যে কথা ছাড়াই মানুষকে বুঝতে পারে।

মন্দার ঘড়িটা দেখে—বলল—আমার চারটেয় একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে। আজ থাক। কোনো দিন আসবো।

—একটু হতাশ হয় নন্দিনী। বলে—আসার তো দরকার ছিল না।

—ছিল। সে তুমি বুঝবে না।

—বুঝবো না কেন?

—আমি নিজেই বুঝি না।

—বলে মন্দার কলেজ থেকে বেরিয়ে এল।

মাত্র গোটা চারেক টাকা পকেটে আছে। তবু মন্দার আবার ট্যাক্সি খুঁজতে লাগল। খানিকদূর হেঁটে পেয়েও গেল একটা। দক্ষিণ দিকে ট্যাক্সি চালাতে বলে আবার ঘাড় এলিয়ে চোখ বোজে সে। সঙ্গে সঙ্গে দৃশ্যটা দেখতে পায়। সেই ডবলডেকারের পা-দানি, ভিড়, টালমাটাল অঞ্জলি, কোলে শিশু।

অঞ্জলিদের বাড়ির সামনে ট্যাক্সি ঝেড়ে দিল মন্দার। ভাড়া দিতে গিয়ে

পকেট সম্পূর্ণ ফাঁকা হয়ে গেল। টাকা আর খুচরো যা ছিল, সব দিয়েও পনেরো পয়সা কম হল। ট্যাক্সিওয়ালা হেসে সেটা ছেড়ে দিয়ে গেল।

দরজা খুললেন সেই সুন্দর চেহারার বৃদ্ধ। অঞ্জলির বাবা। খুলে ভারি অবাক।

—বাবাজীবন, তুমি?

—আমিই।

—এসো, এসো।

মন্দার ঘরে ঢোকে। অঞ্জলির মা নেই। ভাইরা বৌ নিয়ে আলাদা থাকে। বোনের বিয়ে হয়ে গেছে। বাড়িটা একটু অগোছাল।

—বসবে না? বুড়ো তাকে চেয়ার এগিয়ে দেয়।

—আমি অঞ্জলির খবর জানতে চাইছি।

বুড়োর ঠিক বিশ্বাস হয় না। একবার চোখ তুলেই নামিয়ে নেয়! বলে—সে ভিতরের ঘরে আছে।

মন্দার চুপ করে থাকে।

বুড়ো খুব সাবধানে জিজ্ঞেস করেন—কী চাও মন্দার? ওকে কিছু বলবে?

—হুঁ।

—যাও না, নিজেই চলে যাও ভিতরে। ডাকলেই সাড়া পাবে।

সাত দিনের জন্য এ বাড়িটা তার শ্বশুরবাড়ি ছিল, এই সুন্দর বৃদ্ধটি ছিলেন তার শ্বশুর। বাড়িটা মন্দারের চেনা। একটু সংকোচ হচ্ছিল, তবু মন্দার উঠল।

বৃদ্ধ বলে—ভিতরে বাঁ দিকের ঘরে আছে।

মন্দার যায়।

দরজা খোলা। অঞ্জলি শুয়ে আছে বিছানায়। পাশে একটা পুঁটলির মতো বাচ্চা তুলতুল করে। সে ঘুমোচ্ছে।

মন্দার ঘরে পা দিতেই অঞ্জলি মুখ ফিরিয়ে তাকাল। চমকে উঠল কিনা কে জানে! অবাক হল খুব। উঠে বসল খুব ধীরে। কোনো প্রশ্ন করল না। কেবল বাচ্চাটাকে একটা হাত বাড়িয়ে আড়াল করার চেষ্টা করল। চোখে ভয়। মন্দার হাসে। জিজ্ঞেস করে—কবে হল?

—আজ আট দিন।

—ভাল আছো?

—না। খুব কষ্ট গেছে।

—আমার শরীরে রক্ত ছিল না। বলে শ্বাস ফেলল অঞ্জলি—খুব কষ্ট গেছে। বিকারের মতো হয়েছিল। তুমি বোসো। ঐ চেয়ার টেনে নাও। কিছু বলবে?

—বলব।

—কী?

—আমি ভীষণ অসুখী।

—হওয়ার কথাই। এখন কী করতে চাও?

—কয়েকটা ভাইটাল প্রশ্ন করব।

—করো।

—তোমার প্রেমিকটি কে?

বিস্ময়ে চোখ বড় ক'রে অঞ্জলি বলে—প্রেমিক?

—ঐ বাচ্চাটার বাবার কথা বলছি।

—সে আমার প্রেমিক হবে কেন? তাকে তো আমি ভালবাসতাম না, সেও আমাকে বাসত না।

—তাহলে এটা কী ক'রে হল?

—হয়ে গেল। কত কিছু এমনিই হয়ে যায়, যা ঠিক বুঝতেই পারা যায় না।

মন্দার একটা শ্বাস ফেলল। ভুল প্রশ্ন। এ প্রশ্ন সে করতে চায়নি। এই প্রশ্ন করতে সে আসে নি? তবে কী প্রশ্ন? কী প্রশ্ন?

সে বলল—তুমি ওর বাবাকে বিয়ে করবে না?

—বিয়ে! ভারি অবাক হয় অঞ্জলি, বলে—তা কি সম্ভব? সে কোথায় চলে গেছে! তা ছাড়া আমি তা করতে যাবো কেন? ওটা বড্ড বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে।

এও ভুল প্রশ্ন। মন্দার বুঝতে পারে। এবং তারপর সে আবার একটা ভুল প্রশ্ন করে—তুমি কি আমার কাছে কিছু চাও?

—না। তুমি অনেক দিয়েছো।

—কী দিয়েছি?

—এই বাচ্চাটার একটা পরিচয়।

মন্দার বিস্ময়ে প্রশ্ন করে—ও কি আমার বাচ্চা হিসেবেই চালু থাকবে নাকি?

—যদি তুমি অনুমতি দাও।

মন্দার একটু ভেবে বলে—থাকুক।

অঞ্জলি খুশি হল। বলল—আমি জানতাম, তুমি আপত্তি করবে না।

আমি বিয়ে করছি অঞ্জলি।

—জানি। করাই উচিত।

তবু সঠিক প্রসঙ্গটা খুঁজে পাচ্ছে না মন্দার। এসব কথা নয়, এর চেয়ে জরুরী কী একটা বলবার আছে তার। বুঝতে পারছে না। খুঁজে পাচ্ছে না। কিছুক্ষণ তাই সে বেকুবের মতো বসে থাকে।

—তোমার শরীরে রক্ত নেই?

—না। কিছু খেতে পারতাম না গত কয়েকমাস। বাচ্চাটা তখন আমার শরীর শুষে খেয়েছে। ওর দোষ নেই। বাঁচতে তো ওকেও হবে। শরীরটা তাই গেছে।

—তোমার অসুখটা কেমন?

—বুঝতে পারছি না। তবে ভীষণ দুর্বল।

—তুমি শুয়ে থাকো বরং। শুয়ে শুয়ে কথা বলো।

—তাই কি হয়! বলে বসে বসে অঞ্জলি একটু কাঁদে, বলে শ্বশুরবাড়িতে এসেছো, তোমাকে কেউ আদরযত্ন করার নেই। দেখ তো কী কাণ্ডটা!

মন্দার চুপ ক'রে থাকে।

অঞ্জলি তক্ষুনি নিজের ভুল সংশোধন ক'রে বলে—অবশ্য এখন তো আর শ্বশুরবাড়ি এটা নয়, আমারই ভুল।

মন্দার একটু দুঃখ পায়। অঞ্জলির মুখটা ফোলা-ফোলা, শরীরও তাই। বোধহয় শরীরে জল এসে গেছে ওর।

মন্দার জিজ্ঞেস করে—তোমার বাচ্চাটা কেমন হয়েছে?

—ভাল আর কী! আমার শরীর থেকেই তো ওর শরীর! একটা খারাপ হলে আর একটা ভাল হবে কী ক'রে?

কিন্তু কী কথা বলতে এসেছে মন্দার? মনে পড়ছে না, কিছুতেই মনে পড়ছে না। অথচ এসব সাধারণ কথা নয়; এ ছাড়া আর একটা কী কথা যেন! মন্দার চুপ ক'রে বসে থাকে। ভাবে। অঞ্জলি তার দিকে তাকিয়ে আছে। চোখে সেই ভীতু ভাব। বোধহয় সবসময়ে নিজের অপরাধের কথা ভাবে ও, আর সবসময়ে ভয় পায় তার অপরাধের প্রতিফল কোনো-না-কোনো দিক থেকে আসবেই।

মন্দার জিজ্ঞেস করল—এ সব জানাজানির পর তোমার অবস্থা নিশ্চয়ই বেশ খারাপ?

অঞ্জলি মুখটা ঘুরিয়ে নিয়ে বলল—তা জেনে কী হবে?

মন্দার একটা শ্বাস ফেলল মাত্র।

সেই শ্বাসের শব্দে অঞ্জলি তার দিকে তাকাল, জলভরা চোখ। বলল—আমি খুব একা। আমার কেউ নেই।

—জানি।

তুমি ভীষণ দয়ালু। তোমার তুলনা নেই। তুমি আমার ওপর রাগ করতে চাইছো, কিন্তু পারছো না।

মন্দার একটু চমকায়। কথাটা সত্য। সে অঞ্জলির ওপর রাগ ঘৃণা সবই প্রকাশ করতে চায়, কিন্তু তার মনের মধ্যে কিছুতেই রাগের সেই ঝড়টা ওঠে না। উঠলে ভাল হতো বোধহয়। মন্দার আবার একটা শ্বাস ফেলে।

বাইরে থেকে অঞ্জলির বাবার গলা পাওয়া যায়—মন্দার!

মন্দার মুখ ফিরিয়ে ভারি অবাক হয়। সুন্দর বৃদ্ধটি দরজায় দাঁড়িয়ে। তাঁর এক হাতে খাবারের প্লেট, অন্য হাতে চায়ের কাপ। মন্দারের চোখে চোখ পড়তেই লাজুক মুখে বলে—বাড়িতে কাজের লোক নেই, তাই...

মন্দার বিস্মিতভাবে বলে—নিজেই করলেন?

—আমার অভ্যাস আছে। আঁতুড় ঘরে বসে খেতে ঘেন্না করে না তো বাবা! তুমি না হয় বাইরের ঘরে এসো।

—আমি কিছু খাবো না।

—খাবে না? বলে বুড়োমানুষ ভারি অপ্রতিভ হয়ে পড়ে। সাধাসাধি করতে বোধহয় তারা ভয় পায়। মন্দারকে তাদের ভীষণ ভয়।

যেন বা বুড়ো জানত যে, মন্দার এবাড়ির খাবার খাবে না, তাই মাথা নিচু ক'রে বলে—আচ্ছা, তাহলে বরং থাক্।

অঞ্জলি অবাক হয়ে তার বাবার দিকে চেয়ে ছিল। মন্দারের দিকে মুখ ফিরিয়ে বলে—কলেজ থেকে এলে তো?

—হুঁ!

—খিদে পায় নি?

অঞ্জলি চুপ করে থাকে। কিছু বলার নেই। তারা অপরাধীর মত মন্দারের দিকে চেয়ে আছে। জোর করে খাওয়াবে, এমন সম্পর্ক নয়।

অসহ্য। মন্দার উঠে গিয়ে বুড়োর হাত থেকে প্লেট আর কাপ নিয়ে বলে—ঠিক আছে। খাচ্ছি।

বাপ বেটিতে খুব অবাক হয়। তারা একটুও আশা করে নি এটা।

বুড়ো চলে গেল। মন্দার অঞ্জলিকে বলে—এসব ফর্মালিটির দরকার ছিল না। অঞ্জলি কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলে—ডিভোর্স জিনিসটা বাবা বোঝেন না। সেকেলে মানুষ। ওঁর কাছে এখনও তুমি জামাই, বরাবর তাই থাকবে। ওঁদের মন থেকে এসব সংস্কার তুলে ফেলা ভারি মুস্কিল।

মন্দার উত্তর দেয় না।

অঞ্জলি নিজে থেকেই আবার বলে—বাবার আর দোষ কী! আমি নিজেও মন থেকে সম্পর্ক তুলে দিতে পরি নি। স্বামী জিনিসটা যে মেয়েদের কাছে কী!

—ওসব কথা থাক।

অঞ্জলি মাথা নেড়ে বলে—থাকবে কেন! এখন তো আর আমার ভয় নেই। এইবেলা বলতে সুবিধে। আমি হয়তো আর বেশীদিন বাঁচব না।

—কী বলতে চাও?

সংস্কারের কথা। মেয়েলী সংস্কার। মন্ত্র, সিঁদুর, যজ্ঞ—এসব কিছুতেই মন থেকে তাড়াতে পারি না। তুমি আমার কেউ না, তবু মনে হয়, কেবলই মনে হয়....অঞ্জলি চুপ ক'রে থাকে। একটু কাঁদে বুঝি!

মন্দার তাড়াতাড়ি বলে—অঞ্জলি, তোমাকে আমি কি একটা কথা বলতে এসেছিলাম, কিছুতেই মনে পড়ছে না। অথচ কথাটা খুবই জরুরী।

—বলো।

—বললাম তো মনে পড়ছে না।

—একটু বসে থাকো, মনে পড়বে। যদি ঘেন্না না করে তবে খাবারটা খেয়ে নাও। চা জুড়িয়ে যাচ্ছে। খেতে খেতে মনে পড়ে যাবে।

মন্দার অন্যমনস্ক হয়ে বসে থাকে। অঞ্জলি তার দিকে নিবিষ্ট চোখে চেয়ে যেন বুঝবার চেষ্টা করে।

মন্দার একটু-আধটু খুঁটে খায়, চায়ে চুমুক দেয়। মনে পড়ে না।

—তুমি কি আমার কথা মাঝে মাঝে ভাবো? অঞ্জলি আচমকা জিজ্ঞেস করে।

—ভাবি।

—কেন ভাবো?

—তুমি আমার ওপর বড্ড অন্যায় করেছিলে যে।

—সে তো ঠিকই।

—তাই ভুলতে পারি না। মানুষ ভালবাসার কথা সহজে ভোলে; প্রতিশোধের কথাটা ভুলতে পারে না।

—আমি এত অসহায় যে আমার ওপর প্রতিশোধ নেওয়ার কিছু নেই তোমার! আমি তো শেষ হয়েই গেছি।

—কিন্তু আমার তো শোধ নেওয়া হয় নি!

—কি শোধ নেবে বলো?

—কি জানি ভেবেই তো পাচ্ছি না।

—হায় গো, কি কষ্ট!

—খুব কষ্ট। দুপুরে কলেজে একটু ঘুমিয়ে পড়ছিলাম। তখন তোমাকে নিয়ে একটা দুঃস্বপ্ন দেখি।

—কিরকম দুঃস্বপ্ন?

—ভীষণ খারাপ। বলে মন্দার চুপ ক'রে স্বপ্নের দৃশ্যটা মনে মনে দেখে। ডবল-ডেকারে পা-দানিতে অঞ্জলি, কোলে বাচ্চা, চারিদিকে আক্রমণকারী মানুষ। কিছুতেই অঞ্জলির কাছে পৌঁছোতে পরেছে না মন্দার।

—বলবে না? অঞ্জলি বলে।

মন্দার শ্বাস ফেলল। তারপর আস্তে আস্তে বলল—অঞ্জলি, আমি হয়ত শ্রাবণে বিয়ে করব। পাত্রী ঠিক হয়ে গেছে। তাতে কি তুমি দুঃখ পাবে?

—পাবো। তবে এটা আশা করছিলাম বলে সয়ে নেওয়া যাবে।

—শোন, আমি তোমার কাছে মাঝে মাঝে আসবো, এরকম বসে থাকবো একটু দূরে, কথা বলবো। কিছু মনে করবে না তো?

—মনে করবো! কী যে বলো! তুমি আসবে ভাবতেই কি ভীষণ ভালো লাগছে।

—আসবো। কী তোমাকে বলতে চাই তা যতদিন না মনে পড়ছে, ততদিন আসতেই হবে।

—এসো। যখন খুশি।

—আসবো। অঞ্জলি, ততদিন তুমি ভাল থেকো, সাবধানে থেকো।

—অঞ্জলি চুপ করে থাকে।

—চারিদিকে বিশ্রী মানুষ-জন, তারা তোমাকে ঠেলবে, ধাক্কাবে, ফেলে দেবে, চারিদিকে বিপদ।

—কী বলছো?

—খুব বিপদ তোমার। এই বাচ্চাটাকে নিয়ে কি তুমি বাস থেকে নামতে পারবে! আমি যে কিছুতেই তোমার কাছে যেতে পারছি না!

—তুমি কি বলছো?

—সেইটাই তো বুঝতে পারছি না অঞ্জলি! একটু সময় লাগবে। তোমার বাচ্চাটা কি ছেলে না মেয়ে?

—ছেলে।

অকারণ প্রশ্ন। মন্দারের জেনে কোন লাভ নেই। সে বসে রইল। মনে পড়ছে না। কতদিনে মনে পড়বে, তার কোন ঠিক নেই।

যতদিন না পড়ে ততদিন বসে থাকা ছাড়া, অপেক্ষা করা ছাড়া, পরস্পরের মুখের দিকে চিন্তিতভাবে চেয়ে থাকা ছাড়া মানুষের আর কী করার আছে?

আমরা

সেবার গ্রীষ্মকালের শেষদিকে দিন চারেক ইনফ্লুয়েঞ্জাতে ভুগে উঠলেন আমার স্বামী। এমনিতেই তিনি একটু রোগা ধরনের মানুষ, ইনফ্লুয়েঞ্জার পর তাঁর চেহারাটা আরো খারাপ হয়ে গেল। দেখতাম তাঁর হাটুর হাড় দুটো গালের চামড়া ফুঁড়ে বেরিয়ে আছে, গলা বসা, চোখের নীচে গাঢ় কালি, আর তিনি মাঝে মাঝে শুকনো মুখে ঢোক গিলছেন— কণ্ঠাস্থিটা ঘন ঘন ওঠা-নামা করছে। তাঁকে খুব অন্যমনস্ক, কাহিল আর কেমন যেন লক্ষ্মীছাড়া দেখাত। আমি তাকে খুব যত্ন করতাম। বীট গাজর সেদ্ধ, টেংরির জুস্, দু'বেলা একটু একটু মাখন, আর রোজ সম্ভব নয় বলে মাঝে-মধ্যে এক আধটা ডিমের হাফবয়েল তাকে খাওয়াতাম। কিন্তু ইনফ্লুয়েঞ্জার এক মাস পরেও তাঁর চেহারা ভাল হল না, বরং আরো দুর্বল হয়ে গেল। সিঁড়ি ভেঙে দোতলায় উঠে তিনি ভয়ঙ্কর হাঁফাতেন, রাত্রিবেলা তাঁর ভাল ঘুম হত না, অথচ দেখতাম সকালবেলা চেয়ারে বসে চায়ের জন্য অপেক্ষা করতে করতে তিনি ঢুলছেন, কষ বেয়ে নাল গড়িয়ে পড়ছে। ডাকলে চমকে উঠে সহজ হওয়ার চেষ্টা করতেন বটে, কিন্তু স্পষ্টই বোঝা যেত যে তিনি স্বাভাবিক নেই। বরং অন্যমনস্ক এবং দুর্বল দেখাচ্ছে তাঁকে।

ভয় পেয়ে গিয়ে আমি জিজ্ঞেস করলাম— তোমার কী হয়েছে বলো তো।

তিনি বিব্রতমুখে বললেন— অনু, আমার মনে হচ্ছে ইনফ্লুয়েঞ্জাটা আমার এখনো সারেনি। ভিতরে ভিতরে আমার যেন জ্বর হয়, হাড়গুলো কট্ কট্ করে, জিভ তেতো-তেতো লাগে। তুমি আমার গা-টা ভাল করে দেখো তো।

গায়ে হাত দিয়ে দেখি গা স্বাভাবিকের চেয়ে অনেক বেশী ঠাণ্ডা। সে-কথা বলতেই তিনি হতাশভাবে হাত উল্টে বললেন— কী যে হয়েছে, ঠিক বুঝতে পারছি না। আমার বোধহয় একটু একসারসাইজ করা দরকার। সকাল বিকেল একটু হাঁটলে শরীরটা ঠিক হয়ে যাবে।

পরদিন থেকে খুব ভোরে উঠে, আর বিকেলে অফিস থেকে ফিরে তিনি বেড়াতে বেরোতেন। আমি আমাদের সাত বছর বয়সের ছেলে বাপিকে তার সঙ্গে দিতাম। বাপি অবশ্য বিকেলবেলা খেলা ফেলে যেতে চাইত না, যেত সকালবেলা। সে প্রায়ই এসে আমাকে বলত— বাবা একটুও বেড়ায় না মা, পার্ক পর্যন্ত গিয়েই দাঁড়িয়ে পড়ে আর রেলিঙে ঠেস দিয়ে ঢুলতে থাকে। আমি বলি, চলো বাবা, লেক পর্যন্ত যাই, বাইচ্ খেলা দেখে আসি, আমাদের স্কুলের ছেলেরাও ওখানে ফুটবল প্র্যাকটিস করে, কিন্তু বাবা রেললাইন পারই হয় না। কেবল ঢুল-ঢুল চোখ করে বলে, তুই যা, আমি এখানে দাঁড়াই, ফেরার সময়ে আমাকে খুঁজে নিস।

আমাদের স্নানঘরটা ভাগের। বাড়িওয়ালা আর অন্য-এক ভাড়াটের সঙ্গে। একদিন সকালবেলা অফিসের সময়ে অন্য ভাড়াটে শিববাবুর গিন্নী এসে চুপি চুপি বললেন— ও দিদি, আপনার কর্তাটি যে বাথরুমে ঢুকে বসে আছেন। তারপর আর কোনো সাড়া-শব্দ নেই। আমার কর্তাটি তেল মেখে কখন থেকে ঘোরাফেরা করছেন, এই মাত্র বললেন— দেখ তো, অজিতবাবু তো কখনো এত দেরি করে না—

শুনে ভীষণ চমকে উঠলাম। তাড়াতাড়ি গিয়ে আমি বাথরুমের দরজায় কান পাতলাম। কিন্তু বাথরুমটা একদম নিশ্চুপ। বন্ধ দরজার ওপাশে যে কেউ আছে, তা মনেই হয় না। দরজায় ধাক্কা দিয়ে ডাকলাম— ওগো, কী হল—

তিনি বললেন— কেন?

— এত দেরি করছ কেন?

তিনি খুব আস্তে যেন আপনমনে বললেন— ঠিক বুঝতে পারছি না— তারপর হুড়মুড় করে জল ঢেলে কাকস্নান সেরে তিনি বেরিয়ে এলেন।

পরে যখন জিজ্ঞেস করলাম, বাথরুমে কী করছিলে তুমি? তখন উনি বিরসমুখে বললেন, গা-টা এমন শিরশির করছিল যে, জল ঢালতে ইচ্ছে করছিল না। তাই চৌবাচ্চার ধারে উঠে বসে ছিলাম।

বসে ছিলে কেন?

ঠিক বসে ছিলাম না। জলে হাত ডুবিয়ে রেখে দেখছিলাম ঠাণ্ডাটা সয়ে যায় কিনা।

বলে তিনি কিছুক্ষণ নীরবে ভাত নিয়ে নাড়াচাড়া করে এক সময়ে বললেন, আসলে আমার সময়ের জ্ঞান ছিল না। বাথরুমের ভিতরটা কেমন ঠাণ্ডা

ঠাণ্ডা জলে ভেজা অন্ধকার, আর চৌবাচ্চা-ভর্তি জল ছলছল করে উপচে বয়ে যাচ্ছে খিলখিল করে— কেমন যেন লাগে।

ভয় পেয়ে গিয়ে আমি জিজ্ঞেস করলাম— কেমন?

উনি ম্লান একটু হাসলেন, বললেন—, ঠিক বোঝানো যায় না। ঠিক যেন গাছের ঘন ছায়ায় বসে আছি আর সামনে দিয়ে নদী বয়ে যাচ্ছে—

সেদিন বিকেলে অফিস থেকে ফিরে এসে তিনি বললেন বুঝলে, ঠিক করলাম এবার বেশ লম্বা অনেকদিনের একটা ছুটি নেবো।

নিয়ে?

—কোথাও বেড়াতে যাবো। অনেকদিন কোথাও যাই না। অনু, আমার মনে হচ্ছে একটা চেঞ্জের দরকার। শরীরের জন্য না, কিন্তু আমার মনটাই কেমন যেন ভেঙে যাচ্ছে। অফিসে আমি একদম কাজকর্ম করতে পারছি না। আজ বেলা তিনটে নাগাদ আমার কলিগ সিগারেট চাইতে এসে দেখে যে, আমি চোখ চেয়ে বসে আছি, কিন্তু সাড়া দিচ্ছি না। সে ভাবল, আমার স্ট্রোক-ফোক কিছু একটা হয়েছে, তাই ভয় পেয়ে চেঁচামেচি করে সবাইকে ডেকে আনল। কী কেলেঙ্কারী। অথচ তখন আমি জেগেই আছি।

—জেগেছিলে! তবে সাড়া দাওনি কেন?

—কী জানো! আজকাল ভীষণ অলস বোধ করি। কারো ডাকে সাড়া দিতে অনেকক্ষণ সময় লাগে। এমন কি, মাঝে মাঝে অজিত ঘোষ নামটা যে আমার, তা বুঝতে অনেকক্ষণ সময় লাগে। কেউ কিছু বললে, চেয়ে থাকি কিন্তু বুঝতে পারি না। ফাইলপত্র নাড়তে ইচ্ছে করে না, একটা কাগজ টেবিলের এধার থেকে ওধারে সরাতে পিনকুশনটা কাছে টেনে আনতে গেলে মনে হয় পাহাড় ঠেলার মতো পরিশ্রম করছি। সিগারেটের ছাই কত সময়ে জামায় কাপড়ে উড়ে পড়ে—আগুন ধরার ভয়েও সেটাকে ঝেড়ে ফেলি না—

শুনে, আমার বুকের ভিতরটা হঠাৎ ধক্ করে উঠল। বললাম—তুমি ডাক্তার দেখাও। চলো, আজকেই আমরা মহিম ডাক্তারের কাছে যাই।

—দূর্! উনি হাসলেন, বললেন—আমার সত্যিই তেমন কোন অসুখ নেই। অনেকদিন ধরে একই জায়গায় থাকলে, একই পরিবেশে ঘোরাফেরা করলে মাথাটা একটু জমাট বেঁধে যায়। ভেবে দেখ, আমরা প্রায় চার-পাঁচ বছর কোথাও যাইনি। গতবার কেবল বিজুর পৈতেয় ব্যাণ্ডেল। আর কোথাও না। চলো, কাছাকাছি কোনো সুন্দর জায়গা থেকে মাসখানেক একটু ঘুরে

আসি। তাহলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। এমন জায়গায় যাবো, যেখানে একটা নদী আছে, আর অনেক গাছগাছালি—

আমার স্বামী চাকরি করেন অ্যাকাউন্ট্যান্ট জেনারেলের অফিসে। কেরানী আর কিছুদিন বাদেই তিনি সাবর্ডিনেট সার্ভিসের পরীক্ষা দেবেন বলে ঠিক করেছেন। অঙ্কে তাঁর মাথা খুব পরিষ্কার, বন্ধুরা বলে—অজিত এক চান্সে বেরিয়ে যাবে। আমারও তাই বিশ্বাস। কিছুদিন আগেও তাঁকে পড়াশুনো নিয়ে খুব ব্যস্ত দেখতাম। দেখে খুব ভাল লাগত আমার। মনে হত, ওঁর যেমন মনের জোর, তাতে শক্ত পরীক্ষাটা পেরিয়ে যাবেনই। তখন সংসারের একটু ভাল ব্যবস্থা হবে। সেই পরীক্ষাটার ওপর আমাদের সংসারের অনেক পরিকল্পনা নির্ভর করে আছে। তাই চেঞ্জের কথা শুনে আমি একটু ইতস্তত করে বললাম—এখন এক-দেড় মাস ছুটি নিলে তোমার পড়াশুনোর ক্ষতি হবে না?

উনি খুব অবাক হয়ে বললেন—কিসের পড়াশুনো?

—ঐ যে এস-এ-এস না কী যেন!

শুনে ওঁর মুখ খুব গম্ভীর হয়ে গেল! ভীষণ হতাশ হলেন উনি। বললেন—তুমি আমার কথা ভাবো, না কি আমার চাকরি-বাকরি, উন্নতি এইসবের কথা? অনু, তোমার কাছ থেকে আমি আর একটু সিমপ্যাথি আশা করি। তুমি বুঝতে পারছ না, আমি কী একটা অদ্ভুত অবস্থার মধ্যে আছি!

আমি লজ্জা পেলাম, তবু মুখে বললাম—বাঃ, তোমাকে নিয়ে ভাবি বলেই তো তোমার চাকরি, পরীক্ষা, উন্নতি সব নিয়েই আমাকে ভাবতে হয়। তুমি আর তোমার সংসার-এ ছাড়া আমার আর কি ভাবনা আছে বলো?

উনি ছেলেমানুষের মতো রেগে চোখ-মুখ লাল করে বললেন—আমি আর আমার সংসার কি এক?

অবাক হয়ে বললাম—এক নও?

উনি ঘন ঘন মাথা নেড়ে বললেন—না। মোটেই না। সেটা বোঝো না বলেই তুমি সব সময়ে আমাকে সংসারের সঙ্গে জড়িয়ে দেখ, আলাদা মানুষটাকে দেখ না।

হেসে বললাম—তাই বুঝি!

উনি মুখ ফিরিয়ে বললেন—তাই। আমি যে কেরানী, তা তোমার পছন্দ

না, আমি অফিসার হলে তবে তোমার শান্তি। এই আমি তোমাকে বলে দিচ্ছি, আমি চিরকাল, এইরকম কেরানীই থাকবো, তাতে তুমি সুখ পাও আর না পাও।

—থাকো না, আমি তো কেরানীকেই ভালবেসেছি, তাই বাসবো।

কিন্তু উনি এ কথাতেও খুশী হলেন না। রাগ করে জানালার থাকের ওপর বসে বাইরের মরা বিকেলের দিকে চেয়ে রইলেন। বেড়াতে গেলেন না। দেখলাম, জ্বর আসার আগের মতো ওঁর চোখ ছলছল করছে, মাঝে মাঝে কাঁপছে ঠোঁট দুটো, হাঁটু মুড়ে বুকের কাছে তুলে এমনভাবে বসে আছেন যে রোগা দুর্বল শরীরটা দেখে হঠাৎ মনে হয় বাচ্চা একটা রোগে-ভোগা ছেলেকে কেউ কোলে করে জানালার কাছে বসিয়ে দিয়েছে।

আচ্ছা পাগল। আমাদের ছেলের বয়স সাত, মেয়ের বয়স চার। আজকালকার ছেলেমেয়ে অল্প বয়সেই সেয়ানা। তার ওপর বাসায় রয়েছে ঠিকে ঝি, ভাড়াটে আর বাড়িওয়ালার ছেলেমেয়ে—এতজনের চোখের সামনে ভর সন্ধেয় কী করে আমি ওর রাগ ভাঙাই! তবু পায়ের কাছটিতে মেঝেতে বসে আস্তে আস্তে বললাম —লক্ষ্মী সোনা, রাগ করে না। ঠিক আছে, চলো কিছুদিন ঘুরে আসি। পরীক্ষা না হয় এবছর না দিলে, ও তো ফি বছর হয়—

উনি সামান্য একটু বাঁকা হাসি হেসে বললেন—তবু দেখ, পরীক্ষার কথাটা ভুলতে পারছ না। এ বছর নয় তো সামনের বার। কিন্তু আমি তো বলেই দিয়েছি কোনোদিন আমি পরীক্ষা দেবো না—

—দিও না। কে বলছে দিতে! আমাদের অভাব কিসের! বেশ চলে যাবে। এবার ওঠো তো—

আমার স্বামীর অভিমান একটু বেশিক্ষণ থাকে। ছেলেবেলা থেকেই উনি কোথাও তেমন আদর যত্ন পাননি। অনেকদিন আগেই মা-বাবা মারা গিয়েছিল। তারপর থেকেই মামাবাড়িতে একটু অনাদরেই বড় হয়েছেন। বি. এস-সি. পরীক্ষা দিয়েই ওকে সে বাড়ি ছেড়ে মির্জাপুরের একটা মেসে আশ্রয় নিতে হয়। সেই মেসে দশ বছর থেকে চাকরি করে উনি খুব নৈরাশ্য বোধ করতে থাকেন। তখন ওঁর বয়স তিরিশ। ওঁর রুম মেট ছিলেন আমার বুড়োকাকা। তিনিই মতলব করে ওঁকে একদিন আমাদের বাড়িতে বেড়াতে নিয়ে এলেন। তারপর মেসে ফিরে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন—আমার ভাইঝিকে কেমন দেখলে? উনি খুব লজ্জা-টজ্জা পেয়ে অবশেষে বললেন—চোখ

দুটি বেশ তো! তারপরই আমাদের বিয়ে হয়ে গেল। আমরা উঠলাম এসে লেক গার্ডেনসের পাশে গরীবদের পাড়া গোবিন্দপুরে। যখন এই একা বাসায় আমরা দুজন, তখন উনি আমাকে সারাক্ষণ ব্যস্ত রাখতেন দুরন্ত অভিমানে—এই যে আমি অফিসে চলে যাই, তারপর কি তুমি আমার কথা ভাবো! কী করে ভাববে, আমি ত্রিশ বছরের বুড়ো, আর তুমি কুড়ির খুকী। তুমি আজ জানালায় দাঁড়াওনি...কাল রাতে আমি যে জেগেছিলাম, কেউ কি টের পেয়েছিল। কী ঘুম বাব্বা!

ওঁর অভিমান দুরন্ত হলেও সেটা ভাঙা শক্ত না। একটু আদরেই সেটা ভাঙানো যায়। কিন্তু এবারকার অভিমান বা রাগ সেই অনাদরে বড় হওয়া মানুষটার ছেলেমানুষী নেই-আঁকড়ে ব্যাপার তো নয়। এই ব্যাপারটা যেন একটু জটিল। হয়তো উনি একেবারে অমূলক কথা বলছেন না। আমি সংসারের ভালমন্দর সঙ্গে জড়িয়েই ওঁকে দেখি। এর বাইরে যে একা মানুষটা, যার সঙ্গে অহরহ বাইরের জগতের একটা অদৃশ্য বনিবনার অভাব চলছে, তার কথা তো আমি জানি না। নইলে উনি কেন লোকের ডাকে সাড়া দেন না, কেন চৌবাচ্চার জলে হাত ডুবিয়ে অনেকক্ষণ বসে থাকেন, তা আমি বুঝতে পারতাম।

রাত্রিবেলা আমাদের ছেলেমেয়ে ঘুমিয়ে পড়লে উনি হঠাৎ চুপি চুপি আমার কাছে সরে এলেন। মুখ এবং মাথা ডুবিয়ে দিলেন আমার বুকের মধ্যে। বুঝতে পারলাম তাঁর এই ভঙ্গীর মধ্যে কোনো কাম-ইচ্ছা নেই। এ যেমন বাপি আমার বুকে মাথা গোঁজে অনেকটা সেরকম। আমি কথা না বলে ওঁকে দুহাতে আগলে নিয়ে ওঁর রুক্ষ মাথা, আর অনেকদিনের আ-ছাঁটা চুলের মধ্যে মুখ ডুবিয়ে গভীর আনন্দের একটি শ্বাস টেনে নিলাম। বুক ভরে গেল। উনি আস্তে আস্তে বললেন—তোমাকে মাঝে মাঝে আমার মায়ের মতো ভাবতে ইচ্ছে হয়। এরকম ভাবটা কি পাপ?

কি জানি! আমি এর কী উত্তর দেবো? আমি বিশ্ব-সংসারের রীতিনীতি জানি না। কার সঙ্গে কী রকম সম্পর্কটা পাপ, কোনটা অন্যায়, তা কী করে বুঝবো! যখন ফুলশয্যার রাতে প্রথম উনি আমাকে জড়িয়ে ধরেছিলেন, সেদিনও আমার শরীর কেঁপে উঠেছিল বটে। কিন্তু সেটা রোমাঞ্চে নয়—শিহরণেও নয়, বরং মনে হয়েছিল—বাঁচলাম! এবার নিশ্চিন্ত। এই অচেনা, রোগা কালো কিন্তু মিষ্টি চেহারার দুর্বল মানুষটির সেই প্রথম স্পর্শেই আমার ভিতরে সেই ছেলেবেলার পুতুলখেলার এক মা জেগে উঠেছিল। ছেলেমেয়েরা

যেমন প্রেম করে, লুকোচুরি করে, সহজে ধরা দেয় না, আবার একে অন্যকে ছেড়ে যায়— আমাদের কখনো সেরকম প্রেম হয়নি।

উনি বুকে মুখ চেপে অবরুদ্ধ গলায় বললেন— তোমাকে একটা কথা বলব কাউকে বোলো না। চলো, জানালার ধারে গিয়ে বসি।

উঠলাম। ছোট্ট জানালার চৌখুপীতে তাকের ওপর মুখোমুখি বসলাম দুজন। বললাম— বলো।

উনি সিগারেট ধরালেন, বললেন— তোমার মনে আছে, বছর-দুই আগে একবার কাঠের আলমারীটা কেনার সময়ে সত্যচরণের কাছে গোটা পঞ্চাশেক টাকা ধার করেছিলাম?

—ওমা, মনে নেই! আমি তো কতবার তোমাকে টাকাটা শোধ দেওয়ার কথা বলেছি!

আমার স্বামী একটা শ্বাস ফেলে বললেন— হ্যাঁ, সেই ধারটার কথা নয়, সত্যচরণের কথাই বলছি তোমাকে। সেদিন মাইনে পেয়ে মনে করলাম এ মাসে প্রিমিয়াম ডিউ-ফিউ নেই, তাছাড়া রেডিওর শেষ ইনস্টলমেন্টটাও গতমাসে দেওয়া হয়ে গেছে, এ মাসে যাই সত্যচরণের টাকাটা দিয়ে আসি। সত্যচরণ ভদ্রলোক, তাছাড়া আমার বন্ধুদের মধ্যে একমাত্র ওরই কিছু পৈতৃক সম্পত্তি আছে— বড়লোক বলা যায় ওকে— সেই কারণেই বোধহয় ও কখনো টাকাটার কথা বলেনি আমাকে। কিন্তু এবার দিয়ে দিই। তাছাড়া ওর সঙ্গে অনেককাল দেখাও নেই, খোঁজখবর নিয়ে আসি। ভেবে-টেবে বিকেলে বেরিয়ে ছ'টা নাগাদ ওর নবীন পাল লেনের বাড়ীতে পৌঁছোলাম। ওর বাড়ির সামনেই একটা মস্ত গাড়ি দাঁড়িয়ে ছিল, যার কাচের ওপর লাল ক্রশ আর ইংরিজিতে লেখা— ডক্টর। কিছু না ভেবে ওপরে উঠে যাচ্ছি, সিঁড়ি বেয়ে হাতে স্টেথস্কোপ ভাঁজ করে নিয়ে একজন মোটাসোটা ডাক্তার মুখোমুখি নেমে এলেন। সিঁড়ির ওপরে দরজার মুখেই সত্যর বৌ নীরা শুকনো মুখে দাঁড়িয়ে ছিল। ফর্সা, সুন্দর মেয়েটা, কিন্তু তখন রুখু চুল, ময়লা শাড়ি, সিঁদুর ছাড়া কপাল আর কেমন একটা রাতজাগা ক্লান্তির ভারে বিচ্ছিরি দেখাচ্ছিল ওকে। কী হয়েছে জিজ্ঞেস করতেই ফুঁপিয়ে উঠল— ও মারা যাচ্ছে, অজিতবাবু। শুনে বুকের ভিতরে যেন একটা কপাট হাওয়া লেগে দড়াম করে বন্ধ হয়ে গেল। ঘরে ঢুকে দেখি, সত্যচরণ পুবদিকে মাথা করে শুয়ে আছে, পশ্চিমের খোলা জানালা দিয়ে সিঁদুরের মতো লাল টকটকে রোদ এসে পড়েছে ওর সাদা বিছানায়। ওর মাথার কাছে

ছোটো টেবিলে কাটা ফল, ওষুধের শিশি-টিশি রয়েছে, মেঝেয় খাটের নীচে বেডপ্যান-ট্যান। কিন্তু এগুলো তেমন উল্লেখযোগ্য কিছু না। ঘরের মধ্যে ওর আত্মীয়-স্বজনও রয়েছেন কয়েকজন। দুজন বিধবা মাথার দুধারে ঘোমটা টেনে বসে, একজন বয়স্কা মহিলা পায়ের দিকটায়। একজন বুড়ো মতো লোক খুব বিমর্ষ মুখে সিগারেট পাকাচ্ছেন জানালার কাছে দাঁড়িয়ে, দুজন অল্পবয়সী ছেলে নিচু স্বরে কথা বলছে। দু-একটা বাচ্চাও রয়েছে ঘরের মধ্যে। তারা কিছু টের পাচ্ছিল কিনা জানি না, কিন্তু সেই ঘরে পা দিয়েই আমি এমন একটা গন্ধ পেলাম— যাকে কী বলব— যাকে বলা যায় মৃত্যুর গন্ধ। তোমাকে ঠিক বোঝাতে পারব না কিন্তু আমার মনে হয় মৃত্যুর একটা গন্ধ আছেই। কেউ যদি কিছু নাও বলত, তবু আমি চোখ বুজেও ঐ ঘরে ঢুকে বলে দিতে পারতাম যে, ঐ ঘরে কেউ একজন মারা যাচ্ছে। যাক্‌গে, আমি ঐ গন্ধটা পেয়েই বুঝতে পারলাম, মীরা ঠিকই বলেছে, সত্য মারা যাচ্ছে। হয়ত এখুনি মরবে না, আরো একটু সময় নেবে। কিন্তু আজকালের মধ্যেই হয়ে যাবে ব্যাপারটা। আমি ঘরে ঢুকতেই মাথার কাছ থেকে একজন বিধবা উঠে গেলেন, পায়ের কাছ থেকে সধবাটিও। কে যেন একটা টুল বিছানার পাশেই এগিয়ে দিল আমাকে বসবার জন্য। তখনো সত্যর জ্ঞান আছে। মুখটা খুব ফ্যাকাশে রক্তশূন্য আর মুখের চামড়ায় একটা খড়ি-ওঠা শুষ্ক ভাব। আমার দিকে তাকিয়ে বলল— কে? বললাম— আমি রে, আমি অজিত। বলল— ওঃ অজিত! কবে এলি? বুঝলাম একটু বিকারের মতো অবস্থা হয়ে আসছে। বললাম— এইমাত্র। তুই কেমন আছিস? বলল— এই একরকম, কেটে যাচ্ছে। আমি ঠিক ওখানে আর বসে থাকতে চাইছিলাম না। তুমি তো জানো ওষুধ-টসুধের গন্ধে আমার কী রকম গা গুলোয়! তাই এক সময়ে ওর কাছে নিচু হয়ে বললাম— তোর টাকাটা দিতে এসেছি। ও— খুব অবাক হয়ে বলল—কত টাকা! বললাম—পঞ্চাশ। ও ঠোঁট ওল্টাল—দূর্, ওতে আমার কী হবে! ওর জন্য কষ্ট করে এলি কেন? আমি কি মাত্র পঞ্চাশ টাকা চেয়েছিলাম তোর কাছে? আমি তো তার অনেক বেশী চেয়েছিলাম! আমি খুব অবাক হয়ে বললাম—তুই তো আমার কাছে চাসনি! আমি নিজে থেকেই এনেছি, অনেকদিন আগে ধার নিয়েছিলাম—তোর মনে নেই? ও বেশ চমকে উঠে বলল—না, ধারের কথা নয়। কিন্তু তোর কাছে আমি কী একটা চেয়েছিলাম না? সে তো পঞ্চাশ টাকার অনেক

বেশী। জিজ্ঞেস করলাম—কী চেয়েছিলি ? ও খানিকক্ষণ সাদা ছাদের দিকে চেয়ে কী ভাবল,বলল—-কী যেন—ঠিক মনে পড়ছে না—ঐ যে—সব মানুষই যা চায়—আহা, কী যেন ব্যাপারটা। আচ্ছা দাঁড়া, বাথরুম থেকে ঘুরে আসি, মনে পড়বে। বলে ও ওঠার চেষ্টা করল। সেই বিধবাদের একজন এসে পেচ্ছাপ করার পাত্রটা ওর গায়ের ঢাকার নীচে ঢুকিয়ে ঠিক করে দিল। কিছুক্ষণ—পেচ্ছাপ করার সময়টা, ও বিকৃত ভয়ঙ্কর যন্ত্রনা ভোগ করল শুয়ে শুয়ে। তারপর আবার আস্তে আস্তে একটু গা-ছাড়া হয়ে আমার দিকে চেয়ে বলল—তোর কাছেই চেয়েছিলাম না কি—কার কাছে যে —মনেই পড়ছে না। কিন্তু চেয়েছিলাম—বুঝলি—কোন ভুল নেই। খুব আবদার করে গলা জড়িয়ে ধরে গালে গাল রেখে চেয়েছিলাম, আবার ভিখিরির মতো হাত বাড়িয়ে ল্যাং ল্যাং করেও চেয়েছিলাম, আবার চোখ পাকিয়ে ভয় দেখিয়েও চেয়েছিলাম, কিন্তু শালা মাইরি দিল না। কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞেস করলাম— কী চেয়েছিলি! ও সঙ্গে সঙ্গে ঘোলা চোখ ছাদের দিকে ফিরিয়ে বলল— ঐ যে— কী ব্যাপারটা যেন— নীরাকে জিজ্ঞেস কর তো, ওর মনে থাকতে পারে, আচ্ছা দাঁড়া— একশ থেকে উল্টোবাগে গুনে দেখি, তাতে হয়তো মনে পড়বে। বলে ও খানিকক্ষণ গুনে হাল ছেড়ে দিয়ে বলল, না, সময় নষ্ট। মনে পড়ছে না। আমি তখন আস্তে আস্তে বললাম— তুই তো সবই পেয়েছিস। ও অবাক হয়ে বলল, কি পেয়েছি— অ্যাঁ, কী? আমি মৃদু গলায় বললাম— তোর তো সবই আছে। বাড়ি, গাড়ি, ভাল চাকরি, নীরার মতো ভাল বৌ, অমন সুন্দর ফুটফুটে ছেলেটা দার্জিলিঙে কনভেন্টে পড়ছে। ব্যাঙ্কে টাকা, ইন্সিওরেন্স— তোর আবার কী চাই? ও অবশ্য ঠোঁটে একটু হাসল, হলুদ ময়লা দাঁতগুলো একটুও চিকমিক করল না, ও বলল— এ সব তো আমি পেয়েইছি। কিন্তু এর বেশী আর একটা কী যেন বুঝলি —কিন্তু সেটার তেমন কোনো অর্থ হয় না। যেমন আমার প্রায়ই ইচ্ছে করে একটা গাছের ছায়ায় বসে দেখি, সারাদিন একটা নদী বয়ে যাচ্ছে। অথচ ঐ চাওয়াটার কোনো মাথামুণ্ডু হয় না। ঠিক সেইরকম কী যেন একটা— আমি ভেবেছিলাম তুই সেটাই সঙ্গে করে এনেছিস। কিন্তু না তো, তুই তো মাত্র পঞ্চাশটা টাকা— তাও মাত্র যেটুকু ধার করেছিলি— কিন্তু কী ব্যাপারটা বলতো, আমার কিছুতেই মনে পড়ছে না—! অথচ খুব সোজা, জানা জিনিস সবাই চায়!

আমার স্বামীকে অন্ধকারে খুব আবছা দেখাচ্ছিল। আমি প্রাণপণে তাকিয়ে তার মুখের ভাবসাব লক্ষ্য করার চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু কিছুই বুঝতে পারছিলাম না। উনি একটু বিমনা গলায় বললেন— অনু, সত্যচরণের ওখান থেকে বেরিয়ে সেই রাত্রে প্রথম বর্ষার জলে আমি ভিজেছিলাম— তুমি খুব বকেছিলে— আর পরদিন সকাল থেকেই আমার জ্বর— মনে আছে?

আমি মাথা নাড়লাম।

—সত্যচরণ তার তিনদিন পর মারা গেছে। সেই কথাটা শেষ পর্যন্ত বোধহয় তার মনে পড়েনি। কিন্তু আমি যতদিন জ্বরে পড়েছিলাম ততদিন, তারপর জ্বর থেকে উঠে এ পর্যন্ত কেবলই ভাবছি— কী সেটা, যা সত্যচরণ চেয়েছিল! সবাই চায়, অথচ তবু তার মনে পড়ল না কেন?

বলতে বলতে আমার স্বামী দুহাতে আমার মুখ তুলে নিয়ে গভীরভাবে আমাকে দেখলেন। তারপর আস্তে আস্তে বললেন— তবু সত্যচরণ যখন চেয়েছিল, তখন আমার ইচ্ছে করছিল, সত্যচরণ যা চাইছে সেটা ওকে দিই। যেমন করে হোক সেটা এনে দিই ওকে। কিন্তু তখন তো বুঝবার উপায় ছিল না, ও কী চাইছে। কিন্তু এখন এতদিনে মনে হচ্ছে সেটা আমি জানি—

আমি ভীষণ কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞেস করলাম— কী গো সেটা?

আমার স্বামী শ্বাস ফেলে বললেন— মানুষের মধ্যে সব সময়েই একটা ইচ্ছে বরাবর চাপা থেকে যায়। সেটা হচ্ছে সর্বস্ব দিয়ে দেওয়ার ইচ্ছে। কোথাও কেউ একজন বসে আছেন প্রসন্ন হাসিমুখে, তিনি আমার কিছুই চান না, তবু তাঁকে আমার সর্বস্ব দিয়ে দেওয়ার কথা। টাকা-পয়সা নয়, আমার বোধ বুদ্ধি লজ্জা অপমান জীবন মৃত্যু— সব কিছু। বদলে তিনি কিছুই দেবেন না, কিন্তু দিয়ে আমি তৃপ্তি পাবো। রোজগার করতে করতে, সংসার করতে করতে মানুষ সেই দেওয়ার কথাটা ভুলে যায়। কিন্তু কখনো কখনো সত্যচরণের মতো মরবার সময়ে মানুষ দেখে, সে দিতে চায়নি, কিন্তু নিয়তি কেড়ে নিচ্ছে তখন তার মনে পড়ে— এর চেয়ে স্বেচ্ছায় দেওয়া ভাল ছিল।

সম্পূর্ণতা

ঠিক পুরুষের মতো গলায় একজন বয়স্ক নার্স চেঁচিয়ে ডাকছিল।

—অমিতাভ গাঙ্গুলি কে? অমিতাভ গাঙ্গুলি?

বাবার মুখ নোয়ানো। হাতের ওপর থুঁতনি রেখে বোধ হয় চোখ বুজে আছে। ডানগালে স্টিকিং প্লাস্টারে সাঁটা তুলোর ঢিবি। ডাক শুনে মুখ তুলে শমীকের দিকে তাকাল। শমীক উঠে দু'পা এগিয়ে থতমত গলায় বলে—এই যে এখানে।

নার্স হাতের কাগজটার দিকে চোখ রেখেই বলে—ক্যান্সার। থার্ড স্টেজ। কিছু করার নেই।

—তাহলে? শমীক প্রশ্ন করে।

উত্তর অবশ্য পায় না। নার্স পরের নাম ধরে ডাকছে—নওলকিশোর ওঝা—

বাবা ওঠে।

—কী বলল?

শমীক যথার্থ বুদ্ধিমানের মতো বলে—কত ভুলভাল বলে ওরা! এর রোগ ওর ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়।

—থার্ড স্টেজ না কী যেন বলছিল! বাবা ধীরে ধীরে বলে।

—রোগটা প্রাইমারী স্টেজে আছে আর কি? ওষুধ পড়লেই সারবে।

হাসপাতালের বাইরে এসে শমীক বলে—ট্যাক্সি নেবো বাবা?

—ট্যাক্সি কেন আবার? তিন নম্বরে উঠে শেয়ালদা চলে যাবো।

শেয়ালদার হোটেলে ফিরে বাবা তার প্যান্ট ক্রিজ ঠিক রেখে যত্নে ভাঁজ করল। হ্যাঙ্গারে টাঙাল জামা। লুঙ্গি পরতে পরতে বলল— থার্ড স্টেজ মানে কি প্রাইমারী স্টেজ?

—হ্যাঁ।

—তবে যে বলছিলি, ওরা ভুলভাল বলছিল!

শমীক অত বুদ্ধি রাখে না। তাছাড়া তার নিজেরও বুকের ভিতরে একটা কী যেন উথলে পড়ছে। তিনটে বোন বিয়ের বাকী। দুই ভাই স্কুলে পড়ে।

তার নিজের বি-এ পাশ করতে এখানো এক বছর। যদি আদৌ পাশ করে। এবং এই অবস্থায় বাবাজী বোধহয় চললেন।

দুই গাল রবারের মতো টেনে হাসল শমীক। বলল—না না। থার্ড স্টেজই বলেছে। তার মানে—

বাবা বিশ্বাস করেছে। কোঁচকানো কপাল হঠাৎ পরিষ্কার হয়ে গেল। বিছানায় পা তুলে আসনপিঁড়ি হয়ে বসে বলল—যদি প্রাইমারী স্টেজই হয়, তবে হোটেলের টাকা গুনে এখানে থাকি কেন? আমাদের চা-বাগানে ফিরে যাই চল। দরকার মতো জলপাইগুড়ি কি কুচবিহারে গিয়ে চিকিৎসা করলেই হবে।

—ডাক্তারকে বলে নিই।

—কালই বল! আমি বরং শিয়ালদায় আজই খোঁজ নিই যদি পরশুর রিজার্ভেশন পাওয়া যায়।

—তাড়াহুড়োর কী আছে? এসেছি যখন ট্রিটমেণ্টটা করিয়েই যাবো। কলকাতার মতো ব্যবস্থা কি মফস্বলে হবে?

বাবা ডানগালের তুলোটা একটু চেপে ধরল। শমীক জানে, তুলোয় ঢাকা আছে একটি ঘা। ঘায়ের ভিতর দিয়ে পচন। ক্রমশ গালের মাংস খসে খসে পড়বে। প্রথম ব্যাপারটা সন্দেহ করেছিল একজন ডেন্টিস্ট। বাবার কষের অকেজো দাঁতটা উপড়ে ফেলে শমীককে আড়ালে ডেকে বলল—দাঁতটা তুলে বোধহয় ভাল করলাম না। দেয়ার ইজ সাম পিকিউলিয়ার সোর। একবার কলকাতায় নিয়ে গিয়ে বড় ডাক্তার দেখাবেন।

শমীক জিজ্ঞেস করল—কেন?

—সন্দেহ হচ্ছে ক্যান্সার।

জলপাইগুড়ির বড় ডাক্তারও সেই একই কথা বলে—কলকাতায় নিয়ে যান। না হলে সিওর হওয়া যাবে না।

গাঙ্গুটিয়া চা-বাগান থেকে শমীক তার বাবাকে নিয়ে কলকাতায় এসেছে। নিশ্চিত হওয়ার জন্য।

আজ নিশ্চিত হওয়া গেল। থার্ড স্টেজ মানে প্রাইমারী স্টেজ নয়। শমীক জানে। বাবা জানে না।

পরদিন বাবাকে হোটেলে রেখে একা হাসপাতালে গেল শমীক। বহু কষ্টে দেখা করল ডাক্তারের সঙ্গে। ডাক্তার সব শুনে হাসলেন।

—হাসপাতালে রেখে লাভ কী? সারবার হলে নিশ্চয়ই রাখবার চেষ্টা করতাম। যে কয়দিন বাঁচেন, আপনার বাবাকে আপনাদের কাছেই রাখুন।

যা খেতে চান দিন, যা যা করতে চান, সব করতে বলুন। মেক হিম হ্যাপী। হাসপাতালের লোনলিনেস আর ড্রাজারীতে শেষ কটা দিন কেন কষ্টের মধ্যে ফেলে রাখবেন? আমাদের কিছু করার নেই।

—আপনি সিওর যে, এটা ক্যান্সার?

ডাক্তার হাসলেন—ইচ্ছে করলে আপনি আর কাউকে কনসাল্ট করতে পারেন। ডক্টর মিত্রকে দেখান, আমি চিঠি লিখে দিচ্ছি। অবশ্য দেখানোটা সান্ত্বনামাত্র।

রাতে খাওয়ার সময় বাবা অনুযোগ করতে থাকে—এরা একেই বিচ্ছিরি খাবার দিচ্ছে, তাও তুই মাছটা ফেলে রাখছিস! ভাত তো কিছুই খেলি না। এখানে এসে সাতদিনে কত রোগা হয়ে গেছিস। ভাল করে খা।

—বাবা, কাল একজন স্পেশিয়ালিস্টের কাছে যাবো।

—কেন?

—ডক্টর মিত্রের খুব নাম। দেখি কি হয়।

—প্রাইমারী স্টেজ যখন, অত ব্যস্ত হওয়ার কী আছে?

—দেখানো ভাল।

—অসুখটা ওরা কী বলছে? নালী ঘা তো?

—তাই।

—ঘাবড়াচ্ছিস কেন?

বাবা তার গলা ভাত আর ঝোল দিয়ে চটকানো কাথের বাটিতে চুমুক দিয়ে বলে—; কী খারাপ রান্না এদের! কিছু গেলা যায় না। তোর মা যে সেদ্ধঝোল রাঁধে, তারও কেমন ভাল স্বাদ।

বাবা শমীকের দিকে চেয়ে থাকে। তারপর আস্তে করে বলে—কাল তোকে রামদুলাল স্ট্রীটের সেই দোকানটায় নিয়ে যাবো। কখনো তো খাসনি, দেখিস কেমন ভাল সন্দেশ করে ওরা! আমরা ছাত্রজীবনে দল বেঁধে গিয়ে খেয়ে আসতাম।

গতকাল নার্সটা চেঁচিয়ে বলেছিল 'ক্যান্সার'। বাবা কি সেটা শুনতে পায়নি? বায়োপসি কেন করানো হল, তাও কি বাবা জানে না? না কি সব জেনে বুঝে বাবাও অভিনয় করে যাচ্ছে।

পরদিন সন্ধেবেলা ডক্টর মিত্রর বিশাল বাইরের ঘরে বাপ-ব্যাটায় বসে আছে। ডাক্টার টেনিস খেলতে গেছেন। আসবেন। শ্লিপে নাম লিখে বেয়ারার কাছে দিয়ে বসে অপেক্ষা করছে আরো দশ-বারোজন লোক। বত্রিশ টাকা ফী দিতে পারে এমন কয়েকজন। শমীক বাইরে একবার সিগারেট খেতে

বেরিয়েছিল। কী সুন্দর বাড়ি। সিনেমায় এ রকম দেখা যায়। সামনে লন, গাড়িবারান্দা, লবী। পেতলের ভাসে সব অদ্ভুত গাছ। লনের ঘাস এদেশের ঘাসই নয়। সিগারেট ধরিয়ে চারদিকটা দেখছিল। সফলতা একেই বলে। কত লোক কত বেশী সুখে আছে।

গায়ের ঘাম তখনো মরেনি, অল্পবয়সী সুন্দর চেহারার এবং হাস্যমুখ ডাক্তারটি চটপটে পায়ে রুগীর ঘরে ঢুকে ভিতর দিকের চেম্বারে চলে যেতে যেতে একবার রুগীদের দিকে চেয়ে মিষ্টি করে হেসে গেলেন। হাসিতে বরাভয়, এবং আত্মবিশ্বাস। শমীকের বুকটা ভরে ওঠে। বাবাকে সে ঠিক জায়গাটিতে নিয়ে এসেছে। এ তো আর হাসপাতালের বাজারী ব্যাপার নয়। এখানে ঠিকমতো পরীক্ষা হবে, বিচক্ষণ ডাক্তার ঘা পরীক্ষা করেই হেসে উঠে বলবেন—আরে দূর! এ তো সেপটিক কেস।

ব্যাপারটা ঠিক সে রকম হল না! ডাক্তারের চিঠিটা পড়ে মিত্র বাবাকে পরীক্ষা করলেন। বায়োপসির রিপোর্টটাও দেখলেন। মুখে হাসিটা ছিলই, আত্মবিশ্বাসও ছিল। বাবাকে বললেন—বয়স কত?

—পঞ্চান্ন।

—ছেলেমেয়ে?

—তিন ছেলে, তিন মেয়ে। এইটি বড়।

ডাক্তার শমীকের দিকে তাকিয়ে হাসলেন—কী করেন?

—পড়ি। বি-এ।

—আর্টস! আমারও খুব ঝোঁক ছিল আর্টস পড়ার। আমার বাবা প্রায় জোর করে ডাক্তারী পড়িয়েছিলেন।

এই সব কথা বললেন ডাক্তার। একটি ছোট্ট চিঠি লিখে দিলেন হাসপাতালের ডাক্তারকে! বললেন—এটা ডক্টর সেনকে দেবেন। প্রেসক্রিপসন যা আছে, তাই চলবে।

—কিছু করার নেই? খুব আস্তে, প্রায় ডাক্তারের কানে কানে বলে শমীক। ডাক্তার হাসলেন।

রাস্তায় একটা ল্যাম্পপোস্টের তলায় চিঠিটা খুলে দেখল শমীক। লেখা—ডিয়ার ডাঃ সেন, দি কেস ইজ হোপলেস। প্লীজ হেলপ দিস ম্যান। মিত্র।

বাবা শমীকের কাঁধের ওপর দিয়ে চিঠিটা দেখছিল—কী লিখে দিল রে? হোপলেস! হোপলেস ব্যাপারটা কী?

চিঠিটা ভাঁজ করে রেখে শমীক বলে—হোপলেস নয়। লিখেছে হেলপলেস! কলকাতায় আমরা তো কিছু জানি না, তাই লিখেছে। অসহায়।

—ও। বাবা একটু গম্ভীর হয়ে বলে—বত্রিশটা টাকা নিল, কোনো প্রেসক্রিপসন দিল না?

—ওই ওষুধই চলবে।

—আর বেশী ছোটাছুটি করিস না। হাসপাতাল, ডাক্তার, এতকিছু করছিস কেন?

—অসুখ বিসুখে এ সব একটু করতেই হয়।

—আমার আর ভাল লাগছে না। যা হবার হবে, চল বাগানে ফিরে যাই।

শমীক মাথা নেড়ে বলে—তাই হবে।

বাবা উজ্জ্বল মুখে বলে—ঠিক তো?

—কাল রিজার্ভেশনের চেষ্টা করব।

বাসরাস্তায় এসে বাবা বলে—এখন কোথায় যাবি?

—কোথায় আর যাবো! হোটেলেই ফিরে যাই চল।

বাবা একটু হাসে। বলে—কাছেই গড়িয়াহাটা। চল একটু দোকানপসার ঘুরে যাই। সস্তায়গণ্ডায় যদি পাই তো সকলের জন্য একটু জামাকাপড় নিয়ে যাবো। পুজোর তো দেরি নেই। কলকাতায় একটু সস্তা হয়।

—এখন থাক বাবা। অনেক টাকা খরচ হয়ে গেল!

—তোর জন্যই তো। খামোকা আজ বত্রিশটি টাকা দিলি।

—ভাল ডাক্তারকে দেখালে নিশ্চিন্ত হওয়া যায়।

—চল, দোকানটোকান একটু দেখে যাই। গড়িয়াহাটের কাপড়ের দোকানের খুব নাম শুনি।

শমীক অগত্যা রাজী হয়। বাপব্যাটায় হাঁটে গড়িয়াহাটের দিকে। বাবা গালের তুলোটা হাতের তেলোয় একটু চেপে ধরে রেখে বলে—কলকাতায় এসে তো কেবল আমাকে নিয়েই হুড়যুদ্ধ করছিস। কাল বেরিয়ে একটু একা-একা ঘুরবি, সিনেমা-থিয়েটার দেখবি। তোদের বয়সে কি কেবল রোগের চিন্তা ভাল লাগে! কাল বেরোস।

শমীক উত্তর দিল না।

পরদিন সকালে উঠে বাবা বলল—কলকাতায় যা শব্দ! রাতে ভাল ঘুম হয় না! বাগানে থাকতে থাকতে এমন অভ্যাস হয়ে গেছে যে নিশুত নিঝুম না হলে চলে না। তার ওপর আবার ছারপোকা।

শমীক জামাকাপড় পরছিল। একবার রেলের বুকিং অফিসে যাবে।

বাবা শ্বাস ফেলে বলল—ঘায়ের ব্যথাটাও হচ্ছিল।

—বিশ্রাম নাও।

—একা ঘরে কি ভাল লাগবে?

—তবে কী করবে?

—একটু বেরোবো ভাবছি। কলকাতা তো আর আমার অচেনা জায়গা নয়।

—শরীর খারাপ। একা বেরোনো কি ঠিক হবে?

বাবা মাথা নেড়ে খুব তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলে—শরীর কিছু খারাপ নয়। বেশ তো আছি। কাছেই যাবো, সীতারাম ঘোষ স্ট্রীটে। খগেন ওখানে থাকত।

—খগেনকাকা! তোমার বন্ধু তো!

ছেলের চোখ থেকে চোখ সরিয়ে নিয়ে বাবা বলে—হ্যাঁ। এখনো আছে কিনা কে জানে! বিশ বছর খবর জানি না। বেঁচেই নেই হয়তো। আমাদের তো এখন সব যাওয়ার বয়স। একে একে সব রওনা হয়ে পড়ব।

শমীক বলল—খগেনকাকার ওখানে যাবেই যদি তাহলে তৈরী হয়ে নাও। আমি তোমাকে পৌঁছে দিয়ে যাবো।

বাবা একটু অবাক হয়ে বলে—তুই সঙ্গে যাবি?

—না হলে তুমি একা এই ভিড়ে যেতে পারবে নাকি!

বাবা একটু ইতস্ততঃ করে বলে—চল।

মনে মনে হাসে শমীক। খগেনকাকা বাবার কেমন বন্ধু, তা সে জানে না। শুধু এইটুকু জানে, বাবা যৌবনবয়সে একটি মেয়েকে এস্রাজ শেখাতো। সেই মেয়েটির প্রতি এক প্রগাঢ় দুর্বলতা জন্মেছিল। কিন্তু বাবা তাকে বিয়ে করতে পারে নি। বিয়ে করেছিল খগেন কাকা। সে ছিল বড়লোকের ছেলে। এ ঘটনা বাবা মাকে গল্প করেছিল। মায়ের কাছে তারা শুনেছে। খগেন নামটা শুনেই পূর্বাপর মনে পড়ে গেল।

সীতারাম ঘোষ স্ট্রীটে বাড়িটা খুঁজে পেতে অসুবিধা হল না। বিশাল বাড়ি! সিঁড়িতে এবং দেয়ালের নিচের দিকে এখনো মার্বেল পাথর দেখা যায়। মস্ত দরজা হাঁ করে আছে। তবে বাড়ির শ্রী দেখলেই বোঝা যায় অবস্থা পড়তির দিকে। রং চটে গেছে, জানলা দরজার পাল্লা জীর্ণ, ভিতরের চীৎকার-চেঁচামেচিতে বোঝা যায় যে-দু'চারঘর ভাড়াটেও বসেছে।

একজন চাকর গোছের লোক তাদের ওপরে নিয়ে গেল। চিকফেলা বারান্দা, ডানদিক ঘুরে দরদালান। দরদালানের প্রথম ঘরটায় তাদের বসিয়ে বলল—বাবু এ সময়টায় থাকেন না। গিন্নিমাকে খবর দিচ্ছি!

বাবা একটু ইতস্ততঃ করে বলল—খগেন বেরিয়ে গেছে?

—আজ্ঞে।

—তাহলে গিন্নিমাকেই বলো, অমিতাভ গাঙ্গুলি এসেছে। এক সময়ে তোমার গিন্নিমাকে আমি বাজনা শেখাতাম। বললে হয়তো চিনতে পারবে।

বলেই বাবা শমীকের দিকে চেয়ে হাসে। কুণ্ঠার সঙ্গে বলে—ছাত্রী ছিল।

শমীক সব জানে। তবু ভালোমানুষের মতো বলে—তাই না কি।

বাবা শ্বাস ফেলে বলে—কতকালের কথা সব। খগেনটা সুদখোর ছিল। সুদেরই কারবার ওদের। কালোয়ারী ব্যবসাও আছে বটে, তবে টাকা খাটানোটাই ছিল আসল।

এ ঘরটা বেশ বড়। পুরোনো আমলের বড় মেহগিনি টেবিল, আবলুশ কাঠের কালো চেস্ট অফ ড্রয়ার্স। সূক্ষ্ম সব ফুল লতাপাতা আর ময়ূরের কাজ-করা বার্মা সেগুনের চেয়ার! চেস্ট অফ ড্রয়ার্সের ওপরে একটা ঢাকনা দেওয়া বাদ্যযন্ত্র রয়েছে। দেখলেই বোঝা যায় যে, এটা এস্রাজ। পাশে একটা তবলা আর পেতলের ডুগী, গদি মোড়া হয়ে বিড়ের ওপর ঘুমোচ্ছে। বাবা এখনো গাঙ্গুটিয়া সন্ধের পর মাঝে মাঝে এস্রাজ নিয়ে বসে। শমীক তবলা ঠোকে।

বাবা হঠাৎ আপন মনে মাথা নেড়ে বলল—চিনতে পারবে না বোধহয়!

—কে চিনতে পারবে না?

—কমলা। কতকালের কথা। বলে বাবা অপ্রতিভ মুখখানা ফিরিয়ে নেয়। গালের তুলোটা হাতের তেলোয় চেপে ধরে। বলে—চেহারাও পাল্টে গেছে।

নিচের তলার ভাড়াটেদের গলার শব্দ হচ্ছে। কিন্তু ওপরতলাটা নিস্তব্ধ। সম্ভবত এ বাড়িতে লোকজন বেশী নেই। একটা ধূপধুনোর গন্ধ আসছিল। একবার একটু পুজোর ঘণ্টা নাড়ার শব্দ এল। বাপব্যাটায় বসে থাকে মুখোমুখি। শমীক বাবার দিকে তাকায় তো বাবা চোখ সরিয়ে নিয়ে দেয়ালের অস্পষ্ট পুরোনো অয়েলপেইন্টিং দেখতে থাকে! হঠাৎ আপন মনে বলে—নেই-নেই করেও এখনো অনেক আছে। এ বাড়িটার ভ্যালুয়েশনই পাঁচসাত লাখ টাকা হবে। অথচ সুদের কারবারীর নাকি ভাল হয় না। এরা তবে এত ভাল আছে কী করে?

শমীক একটু হতাশ হয়। পুরোনো প্রেমিকার বাড়িতে বসে এ আবার কী রকম বিষয়ী কথাবার্তা! একটু পরেই সে আসবে, কাঁপা বুক, স্মৃতি আর অধৈর্য নিয়ে বসে থাকার কথা এখন। তেষ্টা পাবে, কথা হারিয়ে

যাবে, দৃষ্টি চঞ্চল হবে। এ সময়ে বাড়ির ভ্যালুয়েশনের কথা মনে আসবে কী করে?

বাবা শমীকের দিকে তাকিয়ে বলে— তোর দেরি হয়ে যাচ্ছে না?

হোক দেরি। শমীক দৃশ্যটা দেখতে চায়। বাবা যদি কণামাত্র খুশী হয়, যদি প্রেমিকাকে দেখে একটুমাত্র জীবন শক্তি আহরণ করতে পারে, তবে শমীকের বুক ভরে যাবে। সে মুখে বলে—না। দেরি হচ্ছে না।

—রিজার্ভেশন যদি না পাস!

—পাবো না ধরেই নিয়েছি। গাড়িতে যা ভিড়। না পেলে ব্ল্যাকে কিনে নেবো।

—আবার গুচ্ছের টাকা নষ্ট। কাল কাপড়জামায় অনেক বেরিয়ে গেছে।

শমীক হাসল। আবার বিষয়ী কথা! মুখে বলে—সে তো তোমার জন্যই। অত কিনতে কে বলেছিল?

বাবা অপ্রতিভ হাসে। শমীক দরজার দিকে পাশ ফিরে বসেছিল, বাবার দিকে চেয়ে। বাবার দরজার দিকে মুখ। হঠাৎ দেখল, বাবার মুখটা পাল্টে গেল। শরীরটায় একটু শিহরণ কি!

শমীক তাকিয়ে মহিলাকে দেখতে পায়। মাথায় অল্প ঘোমটা, ফর্সা, সুগোল ভারী চেহারা, মুখখানা প্রতিমার মতো সুশ্রী। তার নিজের মায়ের মতোই বয়স হবে, তবে ইনি অনেক সুখী। মুখে একটু হাসি।

বাবা উঠে দাঁড়ায়। মহিলা এগিয়ে এসে পা ছুঁয়ে প্রণাম করেন।

—চিনতে পেরেছো? বাবা জিজ্ঞেস করে।

—ওমা! চিনবো না? এই ছেলে বুঝি!

—বড়জন।

—বসুন।

বাবা বসে। মহিলাও বসেন একটু দূরে চেয়ারে। সাবধান গলায় বলেন—কবে আসা হল? গালে ওটা কি?

বাবা গালের তুলোয় হাত চেপে বলে—এর জন্যই আসা। একটা ঘায়ের মতো। ডাক্তার বলেছে, ভয়ের কিছু নয়।

—ঘা!

—দাঁত তুলে সেপ্‌টিক হয়ে গিয়েছিল।

—ও।

—তোমরা সব কেমন আছ? বহুকাল খবর-বার্তা পাই না।

মহিলা হাসেন। বলেন—আপনি সেই চা-বাগানে এখনো আছেন?

—হ্যাঁ। ওখানেই জীবন শেষ করে ফেললাম।

মহিলা একটা শ্বাস ফেললেন—জানি সবই।

বাবা একটা গলা খাঁকারি দেয়। বলে—খগেনের কেমন চলছে?

—ওই একরকম।

বাবা হেসে বলে—খুব বাবু মানুষ ছিল। সেই কোঁচানো ধুতি গিলে করা পাঞ্জাবী, আর বত্রিশজোড়া জুতো এখনো চালাচ্ছে? চুলে কলপ-টলপ দেয় না?

মহিলা মুখে আঁচল তুলে হাসি ঢাকেন। মৃদুস্বরে বলেন—কলপের দরকার হয় না। টাক পড়ে গেছে।

—পড়ারই কথা। বলে বাবা গম্ভীর হয়ে যায়। এস্রাজটা ইঙ্গিতে দেখিয়ে বলে—এখনো বাজাও?

মহিলা মাথাটা নুইয়ে দেন। মাথা নাড়েন। না, বাজান না।

বাবা চুপ করে দেওয়ালের দিকে চেয়ে থাকে। হলঘর থেকে দেয়ালঘড়ির শব্দ আসে। চাকর মিষ্টির প্লেট রেখে যায়। গেলাসে জল। চা।

বাবা প্লেটের দিকে চেয়ে বলে—চিবোতে পারি না।

—কষ্ট হয়?

—হুঁ। আমার পথ্য লিকুইড।

—শরবৎ করে দিই?

—না।

মহিলা তবু উঠে যান। বোধহয় শরবতের ফরমাশ দিয়ে এসে আবার বসেন। ঘোমটা খসে গেছে। এখনো কী গহীন কালো চুলের রাশি!

—খগেনকে বোলো, আমি এসেছিলাম। কাল বা পরশু ফিরে যাবো।

মহিলা চুপ করে থাকেন। শমীক একটা দুটো মিষ্টি খায়। চা শেষ করে। তারপর উঠে বলে—বাবা, আমি আসি।

যাবে? বাবা তটস্থ হয়ে বলে—আমিই বা বসে থাকি কেন? খগেন যখন নেই!

মহিলা ঘোমটা আবার মাথায় তুলে শমীককে বলেন—তুমি এখন কোথায় যাবে, বাবা?

—একটু কাজ ছিল।

—আমি ওঁকে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করব। উনি একটু থাকুন এখানে, কেমন?

বাবা অপ্রতিভ হয়। শমীক এটাই চাইছিল। তার সামনে জমবে না

ওদের। তার পালানো দরকার এখন। সে মহিলাকে একটা প্রণাম করে বলে—আচ্ছা। বাবার কোন তাড়া নেই। সারাদিন তো একা।

মহিলা হাসলেন। বললেন—আমারও তাই। একা।

বলেই সামলে গেলেন। হেসে বললেন—ছেলেপুলে নেই তো।

খুব ধীরে শমীক দরদালানে বেরিয়ে আসে। বারান্দা পার হয়। সিঁড়ির মুখে চলে আসে। আর সেইখানে নিস্তব্ধ সিঁড়ির মুখে চুপ করে একটু দাঁড়িয়ে থাকে। কিসের জন্য যেন উন্মুখ ও উৎকর্ণ হয়ে থাকে। আর হঠাৎ শুনতে পায়, মৃদু একটা সুরের কেঁপে ওঠা। এস্রাজ বেজে উঠল।

নিশ্চিন্তে শমীক সিঁড়ি ভেঙে নামতে থাকে।

দুপুরে যখন খেতে হোটেলে ফিরেছিল শমীক, তখনো বাবা ফেরে নি। শমীক তাই বেরিয়ে পড়ল। মন ভাল ছিল না! এলোপাথাড়ি ঘুরল কেবল। বাবাজী চললেন। গাছের মতো, স্তম্ভের মতো বাবাজী আর থাকবেন না। তিনটে বোনের বিয়ে বাকি, ভাইরা এখনো নাবালক। কিন্তু সে সমস্যার চেয়ে বড় হচ্ছে শোক। সংসারের অপরিত্যাজ্য, অবিভাজ্য একজন থাকবে না। লোকটা তার প্রেমিকার বাড়িতে সকালে এস্রাজ বাজাতে বসেছিল। জানে না, একটা কালো হাত নালী ঘা বেয়ে নেমে যাচ্ছে তার বুকের সুরের উৎসের দিকে। প্রাণঘড়ির কল টিপে বন্ধ করে দেবে। নার্সটা চেঁচিয়ে বলেছিল—ক্যান্সার, থার্ড স্টেজ। কিছু করার নেই। সে কথা বাবা কি শোনেনি! কিংবা ডাক্তার মিত্রের লেখা চিঠিখানায় 'হোপলেস' শব্দটাও কি দেখেনি নিশ্চিতভাবে! বড় অবাক লাগে। লোকটা নিশ্চিন্ত মনে এস্রাজ বাজাচ্ছিল আজ সকালেও!

ফিরতে সন্ধে হয়ে গেল। এসে দেখল, বাবা খুব নিবিষ্ট মনে স্যুটকেস গোছাচ্ছে। তাকে দেখে আনন্দিত স্বরে বলে—আয়। কোথায় ছিলি!

—ঘুরলাম। তুমি দুপুরে ফেরোনি?

—না। ছাড়ে নাকি! দুপুরে খাওয়াল। ঝোলভাত মেখে নরম করে দিল, ঘোল-টোল, শরবৎ, ফলের রস, মধু, কত কী!

শমীক হাসে। বলে—ভাল।

বাবার মুখে একটা রক্তাভা। একটু বুঝি হাল্কা পলকা তার মন। একটা হাওয়া এসে মনের ওপরকার সব ধুলো উড়িয়ে নিয়ে গেছে। বলল—একটা রাগ শেখাচ্ছিলাম সেই কবে! পুরোটা তখনো তুলতে পারেনি, হঠাৎ বিয়ে হয়ে গেল। আর শেখা হয়নি। আজ সারাদিন সেটা শিখিয়ে দিয়ে এলাম।

—ও।

—অসম্পূর্ণ একটা কাজ সম্পূর্ণ হল।

—খগেনকাকার সঙ্গে দেখা হয়নি?

বাবা একটু গম্ভীর হয়ে বলে—না। সে নাকি অনেক রাতে ফেরে। আমি আর বসলাম না। রাত হয়ে যাচ্ছিল।

—রিজার্ভেশন পেয়েছি বাবা। কালকের।

—পেয়েছো! বাঃ নিশ্চিন্ত! বলে বাবা খুব খুশী হয়। বলে—

—সব দিক দিয়েই ভাল হল। কী বলিস!

—হ্যাঁ বাবা।

বাবা খুব একরকম উজ্জ্বল হাসে। বিছানার ওপর ছড়ানো নতুন কেনা শাড়ি, প্যান্ট আর শার্টের কাপড়, টুকটাক নানান জিনিসের দিকে মমতাভরে তাকিয়ে থাকে বাবা। বলে—জিনিসগুলো খারাপ কিনিনি, না রে? সবাই খুশী হবে।

শমীক একটু দুষ্টুমি করে বলে—কিন্তু অত দামী জিনিস কিনেছো! অত দামী জামাকাপড় তো আমরা কখনো পরি না।

—তা হোক, তা হোক। বাবা খুশীর গলায় বলে—আমার তো এটাই শেষ পুজোর বাজার। এবারটায় না হয় দামীই দিলাম।

বড় চমকে যায় শমীক। একদৃষ্টে বাবার দিকে চেয়ে থাকে। তবে কি বাবা জানে? জেনেও বাবা স্বাভাবিক আছে? এত আনন্দ! অত খুশীর মেজাজ! শমীক মনে মনে বলে, তবে কি জানো, বাবা?

বাবা তার দিকে চোখ তুলে চায়। বলে—একটা অসম্পূর্ণ কাজ সম্পূর্ণ হল, বুঝলে! কমলাকে রাগটা শিখিয়ে এলাম। মনটা বহুকাল ধরে ভার হয়েছিল।

বাবা চুপ করে হাসিমুখে ছেলের দিকে চেয়ে থাকে। শমীক পরিষ্কার বুঝতে পারে, বাবার চোখ নিঃশব্দে তার প্রশ্নের জবাব দিল—জানি হে, জানি!

ভেলা

বিশ শো পঁচাত্তর সালের ফেব্রুআরি মাসের এক সকালে আচমকা কোকিলের ডাক শোনা গেল।

ধরিত্রী তার দুশো তলার ওপরকার ফ্ল্যাটের ঘরদোর পরিষ্কার করছিল। তার হাতে একটা টর্চের মতো ছোট যন্ত্র। সুইচ টিপলে যন্ত্র থেকে একটা অত্যন্ত ফিকে বেগুনী অদৃশ্য রশ্মি বেরিয়ে আসে। সেই রশ্মি চারদিকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ফেললেই ঘর পরিষ্কার হয়ে যায়, জীবাণু থাকে না। ঘর জীবাণুমুক্ত করার পর দেয়ালে একটা সুইচ টিপল ধরিত্রী। কোনো শব্দ হল না, কিন্তু ছাদের গায়ে লাগানো মৌচাকের মতো একটা যন্ত্র জীবন্ত হয়ে উঠল ঠিকই। দুশো তলার ওপরে বদ্ধ ফ্ল্যাটে কোনো ধুলোবালি নেই। তবু ঐ যন্ত্রটা তার প্রবল বায়বীয় প্রশ্বাসে ঘরের যাবতীয় সূক্ষ্ম ধুলোময়লা টেনে নিতে লাগল।

এইসব ঘরের কাজ শেষ করে ধরিত্রী তাদের খাওয়ার ঘরে এল। খাওয়ার ঘরের উত্তরদিকে দুটো দরজা। একটা দরজা ধরিত্রী হাত দিয়ে ছোঁয়ামাত্র সরে গেল দেয়ালের মধ্যে। ওপাশে অবিরল একটা কনভেয়ার বেল্ট বয়ে যাচ্ছে। খুব ধীর তার গতি। তার ওপর থরে থরে খাবার সাজানো। যা খুশী তুলে নেওয়া যায়। একরাশ ডিম চলে গেল, এক ঢিবি মাখন, কিছু আপেল—একটার পর একটা। ধরিত্রী খুব বিরক্তির সঙ্গে চেয়ে রইল। অন্তহীন খাবার বয়ে যাচ্ছে, কিন্তু কোনোটাই তার ছুঁতে ইচ্ছে করল না। দরজাটা বন্ধ করে সে দ্বিতীয় দরজাটা খুলল। দরজার ওপাশে অগাধ শূন্যতা, দুশো তলার ওপর থেকে নিচে পর্যন্ত একটা ভারী বাতাস থম ধরে আছে। ধরিত্রী একটু ঝুঁকে চারদিকে তাকাল। জলে যেমন নৌকা ভাসে তেমনি বাতাসে ইতস্তত কিছু ভেলা ভেসে বেড়াচ্ছে। সেই বাতাসী ভেলার একটা খুব কাছ দিয়েই ভেসে যাচ্ছিল, তাতে এক বুড়ো হালের মতো একটা যন্ত্রের হাতল ধরে বসে আছে। লোকটা একবার ধরিত্রীর দিকে উদাস চোখে তাকাল। ধরিত্রী তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকে।

লোকটা হাতলটায় সামান্য চাপ দিতেই ভেলাটা মুখ ঘুরিয়ে ভেসে এল

ধরিত্রীর দিকে। ব্যাটারিচালিত ভেলাটায় কোনো শব্দ নেই। নিঃশব্দে স্থির হয়ে হালকা ধাতুর তৈরি সাদা গোল লাইফ বেল্টের মতো দেখতে যানটি দরজার গায়ে লেগে রইল।

বুড়ো লোকটা কথা বলল না, ধরিত্রীর দিকে চেয়ে একটু হাসল মাত্র। খুব নিরাবেগ হাসি।

ধরিত্রী বলল—আমার কিছু ফুল দরকার। আসল ফুল।

লোকটা মাথা নাড়ল। তারপর একটু ভারী গলায় বলল—কোন ঋতুর ফুল ?

ধরিত্রী একটু ভ্রূ কুঁচকে বলল—এটা তো বসন্তকাল।

লোকটা মাথা নাড়ল—হ্যাঁ।

—তাহলে বসন্তের ফুল। কিন্তু আসল ফুল, সিন্থেটিক নয়।

লোকটা হাসল। মাথা নাড়ল। বলল—আমি আসল ফুল জানি। আমি তো উনিশশো পঁচাত্তরের লোক।

ধরিত্রী সামান্য কৌতূহলের সঙ্গে বলল—তাই নাকি! তাহলে তো বেশ পুরোনো হয়েছেন!

—হ্যাঁ। লোকটা মাথা নেড়ে বলে—আমার চারবার মৃত্যু হয়েছে। আমার হৃদ্‌যন্ত্র, চোখ, ফুসফুস আর লিভার সব ট্রান্সপ্ল্যান্ট করা। মেডিক্যাল বোর্ড থেকে নোটিশ দিয়েছে, আমার ব্রেনটাও এবার ট্রান্সপ্ল্যান্ট করতে হবে। যদি সেটা করতে হয় তবে আমার সব শৈশবস্মৃতি চলে যাবে। আশি নব্বই বছর আগেকার কোনো কিছুই থাকবে না। এমন কি আমার আত্মপরিচয় পর্যন্ত পালটে যাবে। আমি নতুন মানুষ হয়ে যাবো।

ধরিত্রী একটু দুঃখিত হল। লোকটা ভাবপ্রবণ, তাই পুরোনো কথা সব ধরে রাখতে চায়। বলল—উপায় কি, বলুন।

লোকটা মাথা নাড়ল, বলল—না, উপায় নেই। কিন্তু তখন আর আসল ফুল কাকে বলে তা বুঝতেই পারব না হয়তো। এক ঘন্টার মধ্যেই ফুল পেয়ে যাবেন।

লোকটা হাতলটা বুকের কাছে ধরে চাপ দিল। ভেলাটা উল্কার মতো ছিটকে বাতাসে মিলিয়ে গেল। ধরিত্রী ঝুঁকে লোকটার গতিপথ লক্ষ্য করতে গিয়ে টাল সামলাতে পারল না। দরজায় কোনো চৌকাঠ বা হাতল নেই যে ধরবে। ভারসাম্য হারিয়ে পিছলে দরজার বাইরে শূন্যতায় পড়ে গেল। কিন্তু ভয়ের কিছু ছিল না। এখানে ভারী কৃত্রিম বাতাসে আর কমিয়ে-রাখা মাধ্যাকর্ষণে কেউ খুব জোরে পড়ে না। ধরিত্রীও পড়ল না। মাত্র তার

ফ্ল্যাট থেকে দুতলা পর্যন্ত নিচে ধীরে ধীরে পড়ে গিয়েছিল সে। একটা বাতাসী ভেলা ছুটে এসে তাকে কোলে তুলে নিল। এ ভেলায় একজন যুবক রয়েছে। সে একটু হেসে বলল—কি হয়েছিল ?

ধরিত্রী হেসে বলল—হঠাৎ।

যুবকটি মাথা নাড়ল। বুঝেছে।

ভেলাগুলো চমৎকার লাইফ বেল্টের মতো দেখতে হলেও মাঝখানটা ফাঁকা নয়, সেখানে একটা বাটির মতো আধার লাগানো। আর চমৎকার নরম কুশনের তৈরি বসবার জায়গা। ধরিত্রী বসল। ভেলাটা ধীরে ধীরে তার ফ্ল্যাটের দরজায় তুলে দিল তাকে। আর তখনই ধরিত্রী কোকিলের ডাক শুনতে পেল। একটা-দুটো কোকিল ডাকছে। ধরিত্রী আকাশের দিকে তাকাল। সূর্য দেখা যাচ্ছে, আকাশের নীল প্রতিভাত। কিন্তু সবই দেখা যাচ্ছে একটা অতি স্বচ্ছ ফাইবার গ্লাসের ডোম-এর ভিতর দিয়ে। শহরের সিকি মাইল উঁচুতে ফাইবার গ্লাসের ঢাকনিটা রয়েছে। তাই বাইরের আবহাওয়া কিছুতেই বোজা যায় না। ঝড় বৃষ্টি টের পাওয়া যায় না। অবশ্য তবু চাঁদ সূর্য তারা দেখা যায়। সবই পরিস্রুত হয়ে আসে। কোনো ক্ষতিকারক মহাজাগতিক রশ্মি এখানে প্রবেশ করতে পারে না, কোনো চৌম্বক ঝড় অলক্ষ্যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে না। সব বড় শহরই ওই ফাইবার গ্লাসের ঢাকনি দিয়ে ঢাকা।

তবু শীত বসন্ত সবই টের পাওয়া যায়। একটা পরোক্ষ আবহনিয়ন্ত্রক যন্ত্র দিয়ে শহরের আবহাওয়া যথাসাধ্য প্রাকৃতিক রাখা হয়। এমন কি বর্ষায় কখনো কখনো বৃষ্টিপাতও করানো হয়ে থাকে।

কোকিলের ডাক শুনে একটু অন্যমনস্ক হয়েছিল ধরিত্রী। ভেলা থেকে নামতে গিয়েও একটু থমকে রইল সে। একটা কোকিল উড়ে এসে ভেলার ওপর বসেছে। ধরিত্রী হাত বাড়ালেই ছুঁতে পারে। কোকিলটা মুখ তুলে তাকে বধির করে দিয়ে ডাকতে লাগল। ধরিত্রী পাখিটার দিকে চেয়ে হাসে। পলিথিন আর কৃত্রিম পশম দিয়ে তৈরি এই সব পাখির পেটে যন্ত্র, বুকে ব্যাটারি, মুখে খুদে স্পিকার বসানো। রিমোট কন্ট্রোল বা পরোক্ষ নিয়ন্ত্রণ-যন্ত্রের সাহায্যে এই সব পাখিকে ওড়ানো হয়, ডাকানো হয়। কারণ, অধিকাংশ পাখির প্রজাতিই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। তবু মানুষকে প্রাকৃতিক স্পর্শ থেকে বঞ্চিত না রাখার জন্যেই এই সব ব্যবস্থা। নিচের দিকে তাকালে দেখা যায় চমৎকার রাস্তাঘাটের পাশে গাছের সারি। পার্কে সবুজ ঘাস। ওখানে যে কিছু আসল গাছ নেই, তা নয়। কিন্তু মাধ্যাকর্ষণ নিয়ন্ত্রণ করার

জন্য শহরের যে ভিত তৈরি করতে হয়েছে তাতে গাছ জন্মানো দুষ্কর। তাই শতকরা নব্বই ভাগ গাছই কৃত্রিম। রবার, পলিথিন বা ফাইবার গ্লাসের তৈরি। ঘাসও কৃত্রিম। তবু এক যান্ত্রিক কৌশলে ওই সব কৃত্রিম গাছে চমৎকার মরশুমি ফুল হয়। ফল ফলে। হুবহু আসলের মতো। সেই সব ফুল গন্ধময়, ফল সুস্বাদু। শহরে বসন্তকাল এল।

ভেলা ছেড়ে ধরিত্রী উঠে এল ঘরে। দরজা বন্ধ করে চলে এল শোওয়ার ঘর পার হয়ে তাদের বসবার ঘরে। সেখানে চল্লিশ বছর বয়স্ক বিপুল নামে ব্যক্তিটি বসে আছে। তার মাথায় একটা হেডফোনের মতো যন্ত্র লাগানো। না, যন্ত্রটা কানে লাগাতে হয় না। একটা স্প্রিংয়ে ছোট্ট একটা পিন লাগানো, সেটা ডান কানের ওপরে মাথায় আলতোভাবে স্পর্শ করে থাকে। আর ওই পিনটা পৃথিবীর যাবতীয় খবরের তরঙ্গ মাথার ভিতরে নিঃশব্দে সঞ্চার করে দিতে থাকে। যন্ত্রটার আসল নাম ইনফর্মেশন পিন, সংক্ষেপে ইন্ পিন। খবরের কাগজ পড়ে বা রেডিও শুনে সময় নষ্ট করার দরকার নেই। চোখ এবং কানকে অন্য কাজে ব্যস্ত রেখেও নিঃশব্দে এবং বিনা আয়াসে, প্রায় অজান্তে মস্তিস্কের কোষে সব খবর জমা হয়ে যায়। ইন্ পিন হচ্ছে ইন্দ্রিয়মুক্তির যন্ত্র। চোখ কানকে মুক্ত রেখেই সব জানা যায়।

ধরিত্রীকে দেখে বিপুল যন্ত্রটা খুলে রাখল।

ধরিত্রী মৃদু গলায় বলল—আমি কিছু আসল ফুল আনতে ভেলা পাঠিয়েছি।

বিপুল কিন্তু অন্যমনস্ক ছিল, বলল—আসল ফুল! কেন?

—বাঃ, আজ যে পনেরোই ফেব্রুঅরি। আজ যে আমাদের—

এইটুকু বলল ধরিত্রী, আর বলল না। বিপুল বুঝল। ভ্রূ কুঁচকে একটু চেয়ে রইল ধরিত্রীর দিকে। তার চোখে মুখে সব সময়ে একটা নিস্তব্ধ উত্তেজিত ভাব। বিপুল ক্ষণকাল চুপ করে থেকে বলে—ধরিত্রী, ভেলাওলাকে বলো নি তো যে আজ আমাদের বিবাহবার্ষিকী!

ভয়ার্ত ধরিত্রী বলল—না না। তাই কি বলতে পারি! তারপর ধরিত্রী একটু চুপ করে থেকে বলে—অবশ্য লোকটা আসল ফুল চাই শুনে একটু অবাক হয়েছিল। কিন্তু ভয় নেই, এ লোকটার উনিশো পঁচাত্তর সালে জন্ম। শরীরে অনেকগুলো ট্রান্সপ্ল্যান্টেশন। এ লোকটা সন্দেহ করলেও ক্ষতিকর কিছু বলে বেড়াবে না। ও তো মানুষের বিয়ে দেখেছে এতকালে। ওর মা বাবারও বিয়ে হয়েছিল। হয়তো ওর নিজেরও।

বিপুল উত্তর দিল না। উঠে জানলার কাছে এল। জানলা প্রায় সব সময়েই খোলা থাকে। একটা দূরবীন তুলে বিপুল নিচেটা দেখতে লাগল। পার্কে কিছু নগ্ন নারী পুরুষ এখানে সেখানে বসে আছে। কাছেই বাচ্চারা খেলছে। একটি রমণী কেবলমাত্র একজোড়া স্কেটিং জুতোর মতো জুতো পায়ে চলে যাচ্ছে। ফুটপাথ চলন্ত। রমণীটি তবু সেই চলন্ত ফুটপাথের ওপর দিয়ে আরো জোরে যাচ্ছে। জুতো জোড়া ইলেকট্রনিক শক্তিতে চলে। রমণীটি হাসছে, চিৎকার করে পথচারীদের কি যেন বলছে। কি বলছে তা অবশ্য বিপুল জানে। ও বলছে শরীর নেবে? শরীর! পার্কের কাছে এক প্রৌঢ় সেই রমণীটিকে ধরে পার্কের মধ্যে নিয়ে গেল। বিপুল দূরবীন রেখে ঘরের মধ্যে সরে এল।

উনিশ শো নিরানব্বই সালে এই যৌন-বিপ্লবের শুরু। প্রাচীনপন্থীরা এই মুক্তমিলনে বাধা দিতে চেয়েছিল। প্রায় পঞ্চাশ বছর ধরে চলেছিল লড়াই। বিবাহের সঙ্গে বিবাহহীনতার। তারপর একখানা রাষ্ট্রযন্ত্র বিশ শো উনপঞ্চাশ সালে বিবাহ নিষিদ্ধ করলেন। পবিত্র যৌন-বিপ্লব স্বীকৃতি পেল ইতিহাসে। শুধু তাই নয়, নরনারীর দীর্ঘকালীন একসঙ্গে বসবাসও কার্যত নিষিদ্ধ। কোনখানে নর বা নারীর মধ্যে দখলদারি প্রবৃত্তি দেখলে তাকে শাস্তি দানের আওতায় আনারও চেষ্টা চলছে।

বিপুল বলল—আমরা দশ বছর একসঙ্গে আছি, না ধরিত্রী?

—হ্যাঁ।

বিপুল একটা ছোট্ট বোতাম টিপল। বসবার ঘরে আর শোওয়ার ঘরের মাঝখানের অস্বচ্ছ কাচের পাতলা দেয়ালটা নিঃশব্দে মিলিয়ে গেল মেঝের মধ্যে। ফলে দুই ঘর মিলে একটা বিশাল হলঘরের সৃষ্টি হল। বিপুল পায়চারি করতে লাগল। একবার থেমে বসবার ঘরের দেওয়ালে একটা চৌখুপির মধ্যে বসানো ট্যাপ থেকে এক পাত্র গরম সবুজ চা ভরে নিল পেয়ালায়। খানিকটা খেল, বাকিটা মেঝেয় ফেলে দিল। ধরিত্রী প্রশ্বাস-যন্ত্রটা চালু করে দিতেই মেঝের তরলটুকু মিলিয়ে গেল। পায়চারি করতে করতে বিপুল বলে—তুমি যখন খাওয়ার ঘরে গিয়েছিলে তখন এনকোয়ারী কমিশন থেকে ফোন এসেছিল। ওরা জানতে চাইছে, আমার এই ফ্ল্যাটে একজন মহিলা দশ বছর যাবৎ বাস করছে কেন। এটা প্রচণ্ড বেআইনি। উপরন্তু ওরা যে পবিত্র যৌন-বিপ্লবের মাধ্যমে যৌনমুক্তি এনেছে সে আদর্শ এর ফলে ব্যাহত হচ্ছে। ওদের নির্দেশ, আমরা যেন অবিলম্বে ভিন্ন হয়ে যাই।

ধরিত্রীর মুখ বিষণ্ণ হয়ে গেল। সে বলল—তুমি ওদের বলো নি তো যে তুমি যৌণ-বিপ্লবকে যৌনদাঙ্গা বলে আড়ালে বলে বেড়াও!

বিপুল ভ্রূ কুঁচকে বলে—না। তবে ওরা হয়তো কিছু গন্ধ পেয়েছে। ওরা আরো লক্ষ্য করেছে যে, তুমি আর আমি সব সময়েই জামা-কাপড় পরে বেরোই। ওরা এটাকেও ভাল চোখে দেখছে না। সম্ভবত ওরা শীগগিরই আসবে আমাদের প্রকৃত সম্পর্ক জানতে।

ধরিত্রী চুপ করে রইল।

জানলায় টোকা পড়তেই দুজনে ভয়ঙ্কর চমকে ওঠে। তাকায়। খোলা জানলার বাইরে সাদা গোল ভেলাটা ভাসছে। এক বোঝা রজনীগন্ধা বুকে করে সেই বুড়ো লোকটা দাঁড়িয়ে হাসছে। ওরা তাকাতেই লোকটা ভেলা করে জানলায় পা রেখে ঘরের মধ্যে নেমে এল। ধরিত্রীর হাতে ফুলের গোছা দিয়ে বলল—আসল ফুল।

ধরিত্রী ফুলগুলো বুকে চেপে রইল। তারপর উন্মুখ হয়ে তাকিয়ে থাকল বিপুলের দিকে। বিপুল চিন্তিতভাবে ফুলগুলো দেখছিল।

বুড়ো দুজনের দিকে পর্যায়ক্রমে তাকিয়ে দেখছিল। হঠাৎ একটু হেসে বলল—কোনো বিপদ?

বিপুল মাথা নেড়ে বলে—আমরা দশ বছর একসঙ্গে আছি। তাই এনকোয়ারী কমিশন আসবে।

—খুব খারাপ।

বলে বুড়ো চিন্তিতভাবে মাথা চুলকালো। তারপর বিপুল আর ধরিত্রীর ঘরদোর ঘুরে ফিরে দেখলো একটু। কোনো খাটপালঙ্ক নেই। চেয়ার টেবিল বা আসবাবও নেই বললেই হয়। দেয়ালের গায়ে গায়ে কিছু বোতাম ছাড়া কোনো যন্ত্রাপাতি দেখা যায় না। অবশ্য বোতাম টিপলেই প্যানেলের ভিতর থেকে সব রকম যন্ত্রপাতি বেরিয়ে আসে। আসবাবপত্রও। বসবার ঘরের এক কোণে কিছু কৃত্রিম ফুল সাজিয়ে রাখা। সে ফুল বাসি হয় না, তাতে চিরস্থায়ী গন্ধ। এমন কি সেই ফুলের আশেপাশে খুদে ব্যাটারিচালিত গোটাকয়েক মৌমাছি আর একটা ফরমায়েশী সাদা প্রজাপতি অনবরত ঘুরে বেড়াচ্ছে। এগুলো ফুলের সঙ্গেই পাওয়া যায়। ওই সব কলের কীটপতঙ্গের আয়ু দীর্ঘ। ব্যাটারি ফুরোলে আবার চার্জ করে নেওয়া যায়। বুড়ো এই সব দেখছিল। হঠাৎ বলল—আমি জানি আপনারা স্বামী-স্ত্রী।

বিপুল বলল—চুপ। বোলো না।

ধরিত্রী খুব জোরে মাথা ঝাঁকিয়ে বলল—বলবেই তো। আমি তোমার স্ত্রী, তুমি আমার স্বামী। দশ বছর আগে আমাদের বিয়ে হয়েছিল। আজ আমাদের বিবাহবার্ষিকী।

বাইরে একটা কোকিল ডাকল। যন্ত্রের কোকিল। বুড়ো দুজনের দিকে তাকাল। তারপর দুজনের মাঝখানের শূন্যতার দিকে চেয়ে বলল—আমার মাথাটা একশ বছরের পুরোনো। খুব ধোঁয়াটে। তবু বলি দশ বছর আগে বিয়ে বে-আইনি ছিল। মন্ত্র নেই, পুরুত নেই, রেজিস্ট্রার নেই, তবে আপনাদের বিয়ে হয়েছিল কি ভাবে?

—হয় নি। বিপুল বলে।

—হয়েছিল। ধরিত্রী চেঁচিয়ে বলল—আমরা ফুলের মালা বদল করেছিলাম, আর তুমি কয়েকটা সংস্কৃত মন্ত্র বলেছিলে, যেগুলোর অর্থ আমি বুঝিনি। কিন্তু তবু সেটা বিয়েই।

—ধরিত্রী!

বিতর্ক শুনে বুড়ো মাথা চুলকোয়। বিড়বিড় করে বলে—আমার হৃদ্‌যন্ত্র নতুন, ফুসফুস নতুন, কিন্তু মাথাটা পুরোনো। বড্ড ধোঁয়াটে। কিছু বুঝতে পারছি না। তবে এভাবেও বিয়ে হতে পারে। আগে হত।

—এখন হয় না! বিপুল বলল।

ধরিত্রী কথা বলতে পারল না। কিন্তু ফুলগুলি বুকে চেপে রইল। বিপুল তার দিকে চেয়ে বলল—ধরিত্রী, আমাদের কিছু লুকিয়ে রাখা যাবে না। তার চেয়ে তুমি চলে যাও।

বুড়ো মাথা চুলকোচ্ছিল। বিড়বিড় করে বলল—আরো হয়ত পাঁচশ বছর এরা আমাকে বাঁচিয়ে রাখবে। বার বার শরীরের যন্ত্র বদলে দেবে। আমি সব ভুলে যাবো। অন্য মানুষ, ফের অন্য মানুষ হয়ে বেঁচে থাকতে হবে। ভীষণ মুশকিল।

বুড়োর কথা কেউ শুনছিল না। বিপুল চেয়ে আছে ধরিত্রীর দিকে, ধরিত্রী বিপুলের দিকে।

জানলার বাইরে একটা লাল রঙের ভেলা এসে থেমেছে। ভেলার গায়ে লেখা—অনুসন্ধান। ভেলা থেকে চারজন লোক জানলা টপকে ভিতরে এল। এনকোয়ারি কমিশন।

বুড়ো সেই চারজনকে দেখে সরে এল জানলার কাছে। একটু কষ্টে নিজের ছোট সাদা ভেলাটায় চড়ে বসল। তারপর ভেসে যেতে লাগল। মাথাটা বড্ড ধোঁয়াটে। অনেক কালের কথা জমে পাথর হয়ে আছে। শীগগিরই

এই মাথাটা তার থাকবে না। একদম অন্য রকম হয়ে যাবে। বুড়ো ভাবল—আমাকে কোথাও চলে যেতেই হবে। এরা আমাকে কেবলই বাঁচিয়ে রাখবে, যতদিন এদের খুশী। কিন্তু মরাটাও যে ভয়ঙ্কর দরকার, তা এরা কবে বুঝবে?

সেই রাতে বুড়ো একটা চমৎকার স্বপ্ন দেখল। তার বাবা রাস্তা সমান করার রোলার চালাত। ঘটাং ঘটাং করে প্রচণ্ড শব্দে সেই রোলারটা পুরোনো পৃথিবীর রাস্তাঘাট সমান করত। বুড়ো দেখল, সেই রোলারটায় সে আবার চড়েছে। প্রচণ্ড শব্দে সে রোলারটা চলছে। সামনে শূন্য প্রান্তর, মাঝখানে অফুরান মুক্তির মতো রাস্তা। পিছনে তাড়া করে আসছে বাতাসী ভেলা, রকেট, সন্ধানী আলো, মৃত্যুরশ্মি। বুড়ো ডাকল—বাবা! রোলার চালাতে চালাতে বাবা একবার পিছু ফিরে চেয়ে বললেন—ভয় নেই! আমরা ওদের ছাড়িয়ে যাবো।

বুড়ো একটু হাসল, তারপর নিশ্চিন্তে চোখ বুজল।